# প্রুফ্-রীডার

( প্রথম পর্ব )

মৃণাল গুহঠাকুরতা

পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন ● কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
শুভ নববর্ষ, ১৩৬৮

প্রচ্ছদ :
অরুণ দাস

মুদ্রক :
শ্রী: কৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭/২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

## —দু'চার কথা—

শাস্ত্রকার বলেছেন—"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" আমার এই সামান্য গ্রন্থখানি রচনার মধ্যে কতটুকু শ্রেয়ঃ লুকিয়ে আছে আমি জানি না। তবে বহু বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে এ বইয়ের ব্যাপারে।

দীর্ঘ দশ বছর আগে খেয়ালের বসেই লিখতে শুরু করেছিলাম এ বইটা। কিন্তু অনিবার্য কারণ বশতঃ একটানা লিখতে পারিনি। একপাতা দু'পাতা এক অধ্যয় দু'অধ্যায় করে ক্ষেপে ক্ষেপে লিখেছি। কখনও দু'চার মাস বা বছরও পেরিয়ে গেছে—ছেদ পড়েছে লেখনীতে।

কতদূর কী সৃষ্টি হলো জানি না। তবে বইটি বেরোলো শেষ পর্যন্ত। এই বিরাট বই এই দুর্মূল্যের বাজারে একসংগে কিনতে গেলে ক্রেতা সাধারণের উপর চাপ পড়বে বিবেচনা করেই এর কিয়দংশ শুধু প্রথম পর্বে প্রকাশিত হলো। পরবর্তী অংশ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে প্রকাশিত হবে খুব শীগগিরই। তৃতীয় পর্বই এর শেষ পর্ব।

পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের জ্ঞাতার্থেই জানাচ্ছি এ বইয়ের বহু চরিত্র বা ঘটনার সংগে বাস্তবের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও কেউ যেন মনে করে না বসেন আমি যা দেখেছি তাই লিখেছি এখানে। আসলে এটি একটি উপন্যাস। দেখা শোনার বাইরে চিন্তা ও অনুভূতি দিয়েই তৈরি এ বইয়ের সমস্ত ঘটনা এবং চরিত্র প্রয়োজনের তাগিদে।

বইটি যথাসময়ে আমার পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে না পারায় এবং ছাপার ব্যাপারে কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়ায় আমি দুঃখিত।

নমস্কারান্তে—বিনীত—

**লেখক**

গ্রাম ও পোঃ—কামরাবাদ
সোনারপুর, ২৪ পরগণা।

# ঃ উৎসর্গ ঃ

**কনিষ্ঠপুত্র ৺তমাল কান্তি গুহঠাকুরতার ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির উদ্দেশ্যে—**

ছোট বাবা,

আমার জীবনের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলির কথা মনে পড়ে। আঁধারের সমূদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে এতটুকু আলোর জন্য যখন মাথা কুটে মরছিলাম তখন তুমি এলে। আমি মনোযোগ দিতে পারিনি তোমার দিকে। বুঝিবা সেই অভিমানে ফিরে গেলে তুমি বুকভরা ব্যথা নিয়ে।

সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেছে আজ আমার—আলোক সায়রে নিত্য অবগাহন করছি এখন আমি। কিন্তু কোথায় তুমি? সারা বিশ্বে খুঁজে বেড়াচ্ছি আজ আমি তোমাকে। আমার এ সামান্য গ্রন্থখানি তোমার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ কোরলাম। যেখানে যে লোকেই থাকো তুমি গ্রহণ করে ধন্য কোরো আমাকে।

ইতি—**তোমার বাবা**

এই লেখকের ঃ

জল শুধু জল ( ৩য় সংস্করণ )

ভাগ্যে-ভার্যা ( ২য় মুদ্রণ )

আশা-বিহঙ্গ ( ২য় সংস্করণ )

কপোতী-চঞ্চু নীড়ে ( ২য় সংস্করণ )

তীর্থের কাক

আপনার যারা

পূন্যে-পুত্র ( প্রথম পর্ব ) (যন্ত্রস্থঃ)

প্রুফ্-রীডার ( দ্বিতীয় পর্ব ) (যন্ত্রস্থঃ)

প্লাটফরমের গেট্ পেরিয়ে বাইরে আসতেই অনিলবাবুর সংগে দেখা। যাত্রীদেব দলে উনিও নেমেছেন এই ট্রেন্ থেকে।

ওঁকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লো প্রিয়তোষ। অনিলবাবু কাছে এসে বললেন, এই যে, কেমন আছেন মাষ্টারমশাই ?

—এই আছি একরকম—তারপর, আপনার খবর কী—ভালো আছেন তো ?

সে কথার জবাব না দিয়ে অনিলবাবু বললেন, আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম ক'দিন থেকে—ভালোই হলো দেখা হয়ে। আছেন কোথায় এখন ?

—এখানেই আছি। কোলকাতা গিয়েছিলাম—এই ট্রেনেই ফিরছি।

—হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—টিউশনি করবেন একটা ? যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল এমনি সুরেই বললেন অনিলবাবু।

প্রিয়তোষ বলল, ট্যুইশানি—কোথায় ?

—কোলকাতায়।

—কি রকম।

—মানে সেখানে থাকবেন, খাবেন—তা'বাদে কী নেবেন বলুন ?

একটু ভেবে নিল প্রিয়তোষ। সে বুঝলো নিশ্চয়ই কোন বড় লোকের অপোগণ্ড ছেলেকে পড়াবার কথা বলছেন অনিলবাবু। কারণ, এ লাইনে অভিজ্ঞতা তার অনেক দিনের। ইতিপূর্বে অনেক কালই টিউশানি করে কাটিয়েছে সে। অতএব, মোটা একটা দাও বাগিয়ে নেবার জন্যই সে বলল, তা' শ' খানেক টাকাতো চাই ই।

—আচ্ছা, তা'হলে কথা বলি ওদের সংগে? আমার ছেলেকে পড়িয়েছেন আপনি—আপনাকে আমি জানি। তাই আপনার কথা বলেছি ওঁদের। বলেছি, খুব ভাল মাষ্টার আছে আমার হাতে। তা' আপনার সংগে ঠিক সময় মতো দেখা হয়ে গেল ভালই হলো। কিন্তু কোথায় দেখা হবে আবার আপনার সংগে?

—যেখানে বলবেন।

—এই ট্রেনেই রোজ ফিরি আমি। আপনি কাল এ সময় স্টেশনে আসুন না একবার।

—আচ্ছা।

অনিলবাবুকে ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথে পা বাড়াল প্রিয়তোষ। ষ্টেশান থেকে পৌঁছতে মিনিট পনেরো লাগে। সময়টাকে একটু কমিয়ে নিতে জোরেই হেঁটে যাবে আজ সে ভেবেছিল। অন্যদিনের চেয়ে ফিরতে দেরিই হয়ে গিয়েছিল আজ। কিন্তু এখন সে কথা মনে রইলো না। ধীরে ধীরে চলতে চলতে অনেক কিছু ভাবতে লাগলো প্রিয়তোষ।

কেন ফিরতে একটু দেরি হলে ভাবতে হয় ওকে? হ্যাঁ, সে জানে বৈকি কারণটা। সে বেকার। তবু বসে থাকলে চলে না ওর। কিছু কিছু আয় করতেই হয়। পকেট খরচা আছেই—তার উপর আছে মাসে মাসে বাড়িতে কিছু দেবার তাগিদ। দেয়ও বটে—তবে তা' যথেষ্ট না হলেও, সে দেয়। আর দেয় বলেই দু'মুঠো পায় দু'বেলা। না হলে কবেই সংসার থেকে বেরিয়ে যেতে হতো ওকে ঠিক।

প্রিয়তোষ জানে বর্তমান যুগে স্নেহ ভালবাসা বা আত্মীয়তার মূল্য কতটুকু। প্রতিটি মানুষ আজ বিব্রত নিজেকে নিয়ে। একটি মানুষের আয়ে যেখানে দ্বিতীয় একটি মানুষকে প্রতিপালন অসম্ভব সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির কথা ভাবাই যায় না।

তাই না মানুষ আজ নির্মম। তার চোখে আজ আপন অস্তিত্বের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। এ জন্যই হয়তো স্বামী

আজ স্ত্রীকে ঠেলে দিচ্ছেন রোজগার করতে—পিতা কন্যাকে পাঠাচ্ছেন চাকরির বাজারে।

না, ক'মাস আগে ওকে সংসার থেকে ছাঁটাই করে দেবার পেছনে কোন অন্যায়ই ছিল না দেবতোষের। দেবতোষ ওর ভাই। ছোট ভাই। সম্প্রতি বিয়ে করেছে। ওঁদের স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে যেখানে চাকরি করতে হয় সেখানে সে বড় ভাই হয়ে ওদের ঘাড়ে বসে খাবে তা চলতে পারে না।

তবু চালাতে হ'চ্ছিল। কিন্তু প্রিয়তোষের তা ভাল লাগতো না। দু'টো পয়সা দরকার হলে ভাইয়ের কাছে হাত-পাতার চেয়ে চরম লজ্জাকর এ যুগে আর নিশ্চয় কিছু নেই।

ওকে অবশ্য অনেকদিনই এ লজ্জার মুখোমুখি হতে হয়েছে। নিজের সব প্রয়োজনকে ঠেকিয়ে রাখা গেলেও ট্রেনের মান্থলি আর বিড়ি সিগারেটের পয়সার জন্য অনেকদিনই দু'চার পয়সা চাইতে হয়েছে দেবতোষের কাছে।

কয়েক মাস যাবত আর হাত পাততে হচ্ছে না। বরং আজকাল সংসারে উলটো সে কিছু কিছু দিচ্ছে।

কলেজ স্ট্রীটে কয়েকটা বইয়ের দোকানে জানাশোনা ছিল। ঘুরে ঘুরে তাদের প্রুফ দেখে কিছু কিছু এখন আয় করে প্রিয়তোষ। কিন্তু এ আয় অনিশ্চিত। কোনদিন হয়, কোনদিন একেবারে শুধু হাতেই ফিরতে হয়।

এককালে অনিলবাবুর ছেলেকে পড়াতো প্রিয়তোষ। পর পর তিনটি বছর ঐ ছেলেকে পাশ করিয়ে দিয়েছে সে। তার ফলেই একটা ভাল ধারণা হয়ে গেছে অনিলবাবুর ওর উপর। এ টিউশানিটার সন্ধান এনেছেন তিনি তাই ওর জন্যে। যদি হয়েই যায়, হ্যাঁ প্রিয়তোষ নিয়েই নেবে কাজটা।

ওর জীবনের লক্ষ্য একটি। প্রিয়তোষ একজন লেখক হতে চেয়েছিল। জীবনের এতগুলো বছর সে পার করে এসেছে সেই কল্পনা নিয়ে। যদিও সে কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি তবু আজও

হাল ছাড়েনি প্রিয়তোষ। এখনও তার আশা সে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই সাহিত্যক্ষেত্রে।

পথ চলতে চলতে তাই ভাবল প্রিয়তোষ যদি অনিলবাবুর কথিত টিউশানিটা সে পেয়ে যায় আর ওই রকমই একটা মোটা অঙ্কের হাত খরচ পাওয়া যায় সত্যিই মাসে মাসে তা'হলে ভালই হবে। দু'বেলা পড়াবার পর বসে-বসে লেখা যাবে বেশ করে। ওর বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। কিন্তু তার গণ্ডী আজও কয়েকটি পত্র-পত্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। না, এখনও একটি বই প্রকাশ করতে পারেনি প্রিয়তোষ।

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল সে। যে সময়ে সে ফেরে তার থেকে পনেরো কুড়ি মিনিট দেরি হয়ে গেছে আজ। না, কেউ বসে নেই ওর জন্যে। ভাইয়ের ঘরের দরজায় খিল্ পড়েছে। মায়ের ঘরেরও তাই। শুধু একটি বাতি মিট মিট করে জ্বলছে সে ঘরে।

দেবতোষের ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে। ভয়ে ভয়েই সে ধীরে মায়ের ঘরের দরজায় আঘাত করলো। মা জেগেই ছিলেন। বললেন, কে—খোকা?

—হ্যাঁ।

—দেরি করলি কেন, এই তো বৌমা শুয়ে পড়লো।

মা উঠে দরজা খুলে দিলেন। জামা-কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে খাবার ঘরে গেল প্রিয়তোষ। মা উঠে এলেন খাবার দিতে।

প্রিয়তোষ বলল, তুমি আবার উঠলে কেন? আমি নিজেই নিয়ে নিচ্ছি—তুমি যাও না শুয়ে পড়ো গিয়ে।

মা এ কথা না শুনে খেতে দিলেন। প্রিয়তোষ জানে ওর খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত মা উঠবেন না। তাই আর বেশি কিছু বলল না। তা'ছাড়া বিপদও আছে বেশি কথা বলায়। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় দেবতোষ অভিযোগ এনে ফেলবে এখুনি।

খেতে খেতে মায়ের জন্য ব্যথা অনুভব করল প্রিয়তোষ। ওর

মা বৃদ্ধা। বয়েস সত্তর-এর কাছাকাছি। বাত অম্ল ইত্যাদি নানা ব্যাধিতে দুর্বল। এ বয়সে তাঁর চলাফেরায় কষ্ট। তার উপর রাতে উঠে খেতে দেওয়া আরও কষ্টকর।

তবু উপায় নেই প্রিয়তোষের। সংসারের হাল সে ধরতে পারেনি সময় মতো। পারেনি মায়ের সেবার জন্য দ্বিতীয় যে প্রাণীটিকে এ সংসারে তার আনার কথা ছিল তাকে আনতে। লেখা-লেখা করে পাগলের মতো কাটিয়েছে অতীত জীবনকে। অনেক কর্তব্য পারেনি সে করতে সংসারের প্রতি।

যে পরিবারে তার জন্ম সেখানে অর্থের চাহিদাই ছিল মুখ্য—তা'ও পারেনি সে মেটাতে। ওর বয়েস এখন ছত্রিশ। এ বয়েস পর্যন্ত একটা ভালো চাকরি সে জোটাতে পারেনি। যা' ও পেরেছিল তা'ও পারেনি রাখতে।

জীবনে অনেক চাকরি পেয়েছে আবার ছেড়েছে প্রিয়তোষ। এখন সে বুঝেছে চাকরি ওর ধাতে সইবে না। বরং লেখার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই উত্তম। জীবন তরণীর হালটা হয়তো কোনরকমে ধরে রাখা সম্ভব হবে তাতে। কিন্তু সে নিশ্চিন্ততা কই—কোথায় বা সেই নির্ভরতা ?

এ যুগে শুধু লিখে পেট চলে না আর লেখকদের। অনেককেই চাকরি-বাকরি বা অন্য কিছু করতে হয়। তাকেও করতে হচ্ছে। কিন্তু সবার যে সুযোগ-সুবিধা ওর মধ্যেই জোটে, তা'র তা' নেই।

দু'টি মাত্র ঘর এ বাড়িতে। ওর জন্য তৃতীয় ঘরটির ভাড়া কে দেবে ? রাতে মা'র সংগে একই শয্যায় শুতে হয় প্রিয়তোষকে। সে ঘরটি এত ছোট যে দ্বিতীয় শয্যা পড়ে না। না, একটি চেয়ার টেবিলও নেই তার। এমনকি কোথায়ও যে একটি মাদুর পেতে বসবে সে জায়গাটুকুও নেই এ বাড়িতে। আর, যদিও তার ব্যবস্থা একটু কোথাও করা যায় তাহলে রাত জেগে বসে লেখবার কেরোসিন তেলটুকুই বা জুটবে কোত্থেকে ?

শুধু সুযোগ। সুযোগের অপেক্ষায়ই আছে প্রিয়তোষ। এখনও তার ধারণা সুযোগ একদিন ওর আসবেই।

*　　　　*　　　　*

নির্দিষ্ট ট্রেনটায় পরের দিন এসে নামলো প্রিয়তোষ নিজের স্টেশনে নির্দিষ্ট সময়েই। দাঁড়ালো গেটের ধারে। অনিলবাবুর সংগে কথা হবে আজ এমনিই কথা আছে।

যাত্রীরা বেরিয়ে গেলেন একে একে। কিন্তু কোথায় অনিলবাবু? না, আসেননি তিনি। মনে মনে বিরক্ত হলো প্রিয়তোষ। সম্পূর্ণ ট্রেনটা হেঁটে হেঁটে দেখে এল একবার।

ওর স্বভাবই এমনি। যখনি সে যা চায় তখনি তা না পেলে দুঃখিত হয়। অনিলবাবু কথা রাখেননি বলে এখন সে হাল ছেড়ে দিল। তারপর সংগে সংগেই আবার তাঁকে ভুলে বাড়ির পথ ধরলো।

কালকের থেকেও দেরি হয়ে গিয়েছিল আজ আরো। তবু আজ কিন্তু আলো নেভেনি এখনও দেবতোষের ঘরের। মা'র ঘরের দরজাও বন্ধ ছিল না আজ—ভেজানো ছিল। কপাট ঠেলে ভিতরে ঢুকলো প্রিয়তোষ। যথারীতি জামা কাপড় ছাড়লো। তারপর হাত মুখ ধুয়ে খাবারের ঘরে গেল। মায়ের সাড়া শব্দ নেই। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর, দরকারও নেই আজ তাঁকে। দেবতোষের বউ আগেই এসে ভাত বেড়ে বসে আছে।

খেতে বসলো এখন প্রিয়তোষ। ভাইয়ের বউ বলল, ভাত লাগলে ডাকবেন—আমি ও ঘরে যাচ্ছি।

—না, আর কিছু লাগবে না। তুমি যাও শুয়ে পড়গে। খাওয়া হয়ে গেলে আমিই এ ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেবোখ'ন।

অতসী চলে গেল। প্রায় সংগে সংগেই তার ঘরের দরজা বন্ধের শব্দ শোনা গেল। এমন সময় মা উঠে এলেন হঠাৎ খাবার ঘরে। কী ব্যাপার, উনি ঘুমোননি তা'হলে?

প্রিয়তোষ বলল, তুমি আবার উঠে এলে কেন?

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মা বললেন গম্ভীর স্বরে, একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারিস না—কে তোর জন্য রোজ রোজ বসে থাকবে এত রাত পর্যন্ত?

—এত রাত কই—এখন তো মোটে দশটা।

—দশটা কম হলো—বৌমাকে সকালে উঠতে হবে না? তার অফিস নেই?

—আছে তাতে কি—ওরা খেয়ে শুয়ে পড়লেই পারে! আমি তো বলেছি আমার খাবার চাপা দিয়ে রেখে তোমরা যে যার মতো শুয়ে পড়বে। আমি যখন আসবো, খেয়ে দরজা বন্ধ করে দেবো।

—অত রাত পর্যন্ত দরজা খোলা থাকবে? তা'ছাড়া, বৌমা পছন্দ করে না সবাইকে না খাইয়ে নিজে শুতে যেতে।

—কিন্তু আমার যে সন্ধ্যার দিকেই কাজ থাকে বেশি। কিছুতেই সাড়ে আটটার আগে শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরতে পারি না।

—না পারবার কি আছে, একটু চেষ্টা করলেই পারা যায়। কাল থেকে ন'টার মধ্যে আসবি।

—তা আমি পারবো না।

—না পারলে তোমার ব্যবস্থা তুমি দেখো। দেবতোষ আজ স্পষ্টই বলে দিয়েছে, কী এমন রাজকার্য থাকে যে ন'টার মধ্যে ফেরা যায় না বাড়ি?

প্রিয়তোষের মাথাটা কেন যেন গরম হয়ে উঠলো হঠাৎ। হয়তো এতদিনের ব্যর্থতাই এর কারণ—। ভাল মন্দ চিন্তা না করেই বলে উঠলো উচ্চকণ্ঠে, ঠিক আছে আমার জন্য কাউকে বসে থাকতে হবে না—আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিচ্ছি। কথা দিচ্ছি এক তারিখের মধ্যেই চলে যাবো আমি এ বাড়ি ছেড়ে।

—কোথায় যাবি?

—তা' তোমায় ভাবতে হবে না।

—না, তা আর হবে কেন? দেখলাম তো, কতবার গেলি—সেইতো আবার ফিরে এলি শেষ পর্যন্ত।

—এবার আর ফিরবো না।

মা' আর কথা বাড়ালেন না। হয়তো বুঝলেন রাগের বশে ছেলে যা বলে ফেলেছে পরে তা সে ভুলে যাবে। তাঁর যা বলবার ছিল বলা হয়ে গেছে। অতএব শুতে যাওয়াই ভালো।

পরদিন রবিবার। এ দিন প্রিয়তোষ বড় একটা বেরোয় না। চাকরি না করলেও এ দিন তার ছুটি। কারণ কলেজ ষ্ট্রীটের বই পাড়া এ দিন বন্ধ। এতদূর থেকে কোলকাতা গিয়ে বন্ধুদের সংগে আড্ডা দেওয়াও ভালো লাগে না তাই বাড়িতেই থাকে।

আজ কিন্তু ঠিক সময়েই বেরোল। অর্থাৎ সেই দশটা পঞ্চাশের ট্রেনটাই ধরলো। না, সংকল্প বদলায়নি সে। কাল রাতে রাগের বশে মা-কে যা বলেছে সে, সে কথা সে রাখবে। হ্যাঁ, এক তারিখের মধ্যে যেখানে হোক একটা ঘর দেখে নিতে হবে তাকে।

কোলকাতায় থাকা সম্ভব নয়। বরং আশপাসে কোথাও কম ভাড়ায় ঘর পাওয়া যেতে পারে। সোনারপুরে ওর এক বন্ধু আছে। ওকে বলে যদি ওদের ওখানে কোন ছোটখাটো ঘর পাওয়া যায় একটা তা'হলে নিয়ে নেবে প্রিয়তোষ। যদিও তার আয় অনির্দ্দিষ্ট তবু দশ বারো টাকা ভাড়া কি সে দিতে পারবে না?

আর, না পারলে চলবে কেন? কিছু আয় তো সে করছে এখন। দরকার হলে না খেয়েও ঘর ভাড়া দেবে সে। তা'ছাড়া কোলকাতার কাছাকাছি থাকলে আয়ও বাড়বে তার—বেশি রাত পর্যন্ত ঘুরতে পারবে সে কলেজষ্ট্রীটে। এখন ঘর পাওয়া গেলে হয়—একা মানুষের ঘর পাওয়া যে কত কঠিন ব্যাপার এ অভিজ্ঞতা তার আছে। তবু দমলে চলবে না ওকে। তাই সময় মতো সোনারপুরে নেমে পড়লো সে ট্রেন থেকে।

স্টেশন থেকে অধীরের বাড়ি মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। হ্যাঁ, বাড়িতে পাওয়া গেল তাকে।

ওকে দেখে অবাক হলো অধীর। বলল, কী ব্যাপার, এতদিন পরে মনে পড়লো।

অনেকদিন এদিকে আসেনি প্রিয়তোষ। প্রায় দু'বছর চরকি-বাজির মতো ঘুরেছে সে ভাগ্যের পিছনে পিছনে। তাই অধীরের সংগে যোগাযোগ রাখা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। অধীর অবাক হলো। কিন্তু প্রিয়তোষ সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলল, এই চলে এলাম—

—বেশ, বেশ! সানন্দে ওকে গ্রহণ করলো অধীর। সে কবি। প্রিয়তোষ লেখক। দু'জনের জগত দু'টো আলাদা পৃথিবী হলেও ওরা বন্ধু। গল্পে হাসিতে দু'জনে মেতে উঠলো তাই দু'জনকে নিয়ে অনতিবিলম্বে।

সারাটি দিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলো প্রিয়তোষ। আসার সময় নতুন সংকল্পের কথাটি জানিয়ে এসেছে সে অধীরকে। হ্যাঁ, অধীর ওকে কথা দিয়েছে যেমন করেই হোক মাস কাবারের মধ্যে ঘর সে দেখেই দেবে একটা। হাতে আব মাত্র পনেরোটা দিন সময়। এই পনেরো দিনেব মধ্যে মনে মনে প্রস্তুত হতে হবে আবার একা থাকবার জন্য।

বাড়ি ফিরেই জামা-কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লো প্রিয়তোষ। শরীরটা ক্লান্ত। একটু চা খেতে পারলে হতো। কিন্তু কা'কে বলবে সে চা করে দিতে। ভাই, ভাইয়ের বৌ বেরিয়েছে সিনেমায়। মা পূজোয় বসেছেন। অবশ্য নিজে সে করে নিতে পারে চা। এখন ঠিক ইচ্ছে করছে না। তাই শুয়েই রইলো।

একটু পরে মা উঠলেন পূজো সেরে। প্রিয়তোষ টের পেলো। তারপর কখন যে তিনি চা করে নিয়ে এলেন জানতে পারলো না। একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল। এখন মায়ের ডাকে তা ঘুচে যেতেই উঠে বসলো।

চা দিয়ে মা বললেন, কী, ঘর দেখে এলি ?

জবাব দিলো না প্রিয়তোষ।

মা বললেন, পাগলামি রাখ। বলি, বয়েস বাড়ছে না কমছে—দেখলি তো এ্যাদ্দিন পাগলামি করে, এবার সংসারের দিকে মন দে।

নীরবে চা পান করে চলল প্রিয়তোষ।

মা বললেন আবার, তুই যদি সংসারের দিকে মন দিতিস তা'হলে আজ কি দুঃখ ছিল আমার! তোর চিন্তা নিয়েই আমি মরবো—তোর জন্যে যে আমার মরেও শান্তি নেই।

আর ঘরে টিকতে পারলো না প্রিয়তোষ। উঠে এলো সে বাইরে। এই মুহূর্তে মায়ের মুখ থেকে ওই কথাগুলো শুনতে যেন ভাল লাগছিল না তার। তা'ছাড়া ও ধরনের কথা বহুবারই শুনেছে সে মায়ের মুখ থেকে।

কথাগুলোয় যেন কী একটা যাদু মাখা আছে। মানুষের মনকে

দুর্বল করে দিতে জুড়ি নেই তাদের। না, সংকল্পে অটল হতে হবে প্রিয়তোষকে এবার। সে ভাবলো খুব শীগ্‌গিরেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে এ বাড়ি থেকে—নাহলে সে দুর্বল হয়ে যাবে। যাদের নিজের করে পায়নি সে কোনদিন, আর কোনদিন পাবেও না সে তাদের তেমন করে। শুধু শুধু এদের মাঝে থেকে এদেরও অসুখী করা আর মনে মনে নিজেকেও প্রতারিত করা। কেন? সুখ? সুখের আশা করলে তো ওর চলবে না।

পরদিন যথাসময়ে কোলকাতার উদ্দেশ্যে বেরোল প্রিয়তোষ। কলেজষ্ট্রীট পাড়ায় এসে দু'এক জায়গায় সামান্য কাজ যা ছিল সেরে নিল। তারপর ফাঁক পেতেই অধীরের অফিসে গিয়ে হাজির হলো। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়। খানিকটা সময় কাটিয়ে আসা আর ওকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আসা ঘরের কথাটা।

কোলকাতা কর্পোরেশনের ডিস্ট্রিক্ট টু ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে অধীরের চাকরি। এঘর ওঘরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে একদম শেষের ঘরটায় বসে অধীর। ঘরগুলো পেরিয়ে নির্দিষ্ট ঘরটায় এসে থামে প্রিয়তোষ। এই অফিসের কেরানী কবির সাহিত্যিক বন্ধু হিসেবে সকলেই চেনে তাকে। অনেকেই সমীহও করে।

এখানে আসতে ভালই লাগে প্রিয়তোষের। আড্ডা দেবার এমন দ্বিতীয় একটি অফিস কোলকাতায় আর খুঁজে পায়নি সে। এরা কখন কাজ করে কে জানে। অধীর যখনই এসেছে দেখেছে ঘরে-ঘরে টেবিলে আসর সরগরম। রাজনীতি, সিনেমা, ফুটবল আর তাস নিয়ে মেতে আছে সম্পূর্ণ অফিসটি। কোথাও টেবিলের উপর ঘন ঘন চাপড়, কোথাও নাটকের অভিনয় কোথাও নাচানাচি। হৈ হুল্লোড়, চেঁচামেচি শুনে বাইরের থেকে কারো কারো এটাকে বাজার বলে মনে হতেও পারে।

প্রিয়তোষের তা হয় না—সে জানে এটা অফিস। কারণ এখানে

শনিবার রবিবার আছে। ছুটি-ছাটা আছে আর আছে প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ দশটার বদলে বারোটা—পাঁচটা কিম্বা এগারোটা—চারটা। সে অবশ্য ঐ সময়ের মধ্যেই আসে।

আজ সে ঢুকতে না ঢুকতেই অধীর উঠে পাশের শূন্য চেয়ারটি নিজের কাছে টেনে আনলো ওর বসবার জন্যে। লাইন করে সাজানো বড় বড় টেবিলের দুধারেই শ্রেণীবদ্ধ চেয়ারগুলি কোনটা পূর্ণ, কোনটা খালি—কোনটার মালিক একঘেঁয়ে তাকে ব্যবহার না করে টেবিলের উপরে উঠে বসেছেন। একটি চেয়ার থেকে ( ওধারের ) একজন উঠে এসে প্রিয়তোষের পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় নাটকের ভঙ্গীতে বললেন, বৈঠিয়ে জনাব—থোড়া মেহেরবানি করকে বৈঠ্ জাইয়ে!

ইনি প্রলয়বাবু। এ সেকসনের সকলের গুরুদেব। প্রিয়তোষ বহুবার তাঁর শিষ্য হতে চাইলেও, ইনি তাকে তা করে নেন্‌নি। বরং সবিনয়ে সকাতরে বলেছেন, তা কি হয়—আপনারা হলেন সাহিত্যিক লোক। আপনারা বাদশা ক্লাসের লোক—মানে জাতির মাথার উপরে আপনাদের ঠাঁই। আমরা আপনাদের বান্দা। আমি আপনার গুরু হব কি—পাপ হবে যে!

তর্কের জায়গা এটা নয়। পরিহাসের মাধ্যম যুক্তির ধার দিয়েও যায় না। অতএব সেকশনের সবার গুরুদেবের কাছে বাদশা বন্‌তে আপত্তি হয়নি প্রিয়তোষের এবং দ্বিধাও হয়নি বান্দার কুর্ণিশ নিতে। সে এলেই বরাবর গুরুদেব যেখানে থাকুন উঠে এসে অমনি কায়দা মাফিক অভিবাদন জানান তাকে। এ সব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

প্রিয়তোষ বসলো। অধীর বলল, তারপর, কী খবর—

—আর খবর! এখন কোন প্রুফ্ নেই, সন্ধ্যার দিকে হতে পারে দু' একটা—সময়টা কাটাতে এলাম।

—বেশ, বেশ!

ততক্ষণে সুবলবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন প্রিয়তোষের পাশে। ওর মুখের দিকে একটু গম্ভীর ভাবে চেয়ে থেকে প্রায় স্বগোতোক্তির ন্যায়

বলে উঠলেন, একটু বসলে এককাপ চা একটা টোষ্ট হবে, একটা সিগারেট হবে আর আড়াইটার মধ্যে পিছন দিকে জল পড়বে।

ইনি জ্যোতিষী। সেক্‌শানের সকলের হস্তরেখা বিচার করে বর্তমান ও ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে থাকেন। গুরুর আদেশে এ জন্যে তিনি কোন পারিশ্রমিক নেননা। প্রিয়তোষ এলেই তিনি তার ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান গণনা করে দেন।

অধীর বললো, জ্যোতিষী তো গণনায় বলল, চা—টোষ্ট জুটবে—আমি যদি আজ শুধু চায়ের অর্ডার দিই ?

সুবলবাবু বললেন, দিতে পারো, গণনায় যা বলছে আমি তাই বলে দিলাম শুধু—লেকিন মনে রেখো, এ ফালতু বাত নেহি !

—ঠিক—ঠিক। আচ্ছা গণক ঠাকুর দেখুন তো হাতে আর কিছু বলছে কিনা। বলেই, প্রিয়তোষ হাতখানা ওঁর সামনে মেলে ধরলো। সুবলবাবু প্রায় সংগে সংগে সেটা নিজ করে ধারণ করে একটু নিরীক্ষণ করে বললেন, হ্যাঁ, বলছে। মানে সাহিত্যিক হবার খুব সাধ মনে—হবেনও ঠিক। তবে একটু দেরি করতে হবে। মানে সময় হয়নি এখনও ?

—তা' কোন কবচ-তাবিচ যদি ধারণ করা যায়, তা'হলে সময়টা কি একটু এগিয়ে আসতে পারে না ?

—না, পারে না !

ও ধার থেকে বিজনবাবু এ সময় হাত বাড়াতেই সুবলবাবু ও ধারে গেলেন গণনা করতে।

অধীর এ সময়ে একটা সিগারেট দিলো প্রিয়তোষকে।

ওধারের বিজনবাবু বলে উঠলেন অমনি, জ্যোতিষী ফললো তো মশাই—সিগারেট পেয়ে গেলেন তো আসতে না আসতেই ?

—ফলবে না মানে ? এ কি চারশো বিশের কারবার নাকি ?

বলেই, বিজনবাবুর হাত ছেড়ে জলের কুঁজো থেকে হাতে করে একটু জল নিয়ে এসে প্রিয়তোষের চেয়ারের পিছন দিকে ছিটিয়ে দিলেন এবার সুবলবাবু।

কেষ্টবাবু পাশ থেকে বলে উঠলেন, দেখলেন মশায় কি অব্যর্থ গণনা—আড়াইটা এখনও বাজেনি, পেছন দিকে ঠিক জল পড়ে গেল আপনার।

সুবলবাবু বললেন, কেন আমি তো বলেছি, আড়াইটার মধ্যে পড়বে। সবাই হেসে উঠলেন হো-হো করে। প্রিয়তোষ যোগ দিলো সে হাসিতে।

চা দোকানের ছোকরা এসে হাজির হলো এ সময়। প্রত্যহ টিফিন্ টাইমে সে আসে। এ সেকশনের বাবুরা বাইরে যাননা কেউ বড় একটা টিফিন করতে। সময় কোথায়—ও সময়টার পূর্বেই যে তাসের আসর বসে যায়। আজও বসেছে একধারে। জন চারেকের মধ্যে ফিসের লড়াই চলছে তখন জোর চালে পাঁচ পয়সা পার কার্ড নিয়ে। তাদের এদিকে নজর দেবার সময় নেই।

অধীর চা টোষ্টের অর্ডার দিলো দু'জনের মতো। সুবলবাবুর গণনার বাকি অংশটুকু ফলল এবার।

হাসি ঠাট্টায় গল্পে-গুজবে সময়টা কেটে গেল দেখতে-দেখতে। অধীরকে ঘরের তাগিদ দিয়ে বেরোল প্রিয়তোষ। একজায়গায় প্রুফ এসে গিয়েছিল। সেখানে বসে সে প্রুফ দেখে দিয়ে অন্য জায়গায় গেলো প্রুফ দেখতে। সেখানে বসার জায়গা নেই। অতএব পূর্বের জায়গায় ফিরে এসে সে প্রুফ দেখলো। তারপর তা' যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে ষ্টেশনের পথ ধরলো। রাত আটটা পঁচিশের গাড়ি ধরতেই হবে।

এ ট্রেন ধরলেও বাড়ি পৌঁছতে দশটা হয়ে যাবে। আগের ট্রেনে ফিরতে পারলে ভাল হয়—কিন্তু সে ভালো হওয়াতে গেলে এ দিকে কাজের ক্ষতি করতে হয়। পাঁচটার আগে কোন প্রেসেরই প্রুফ্ আসে না।

একটানা এক ঘেয়েমীর মাঝে কয়েকটা দিন কেটে গেল প্রিয়তোষের। দিন যত যাচ্ছে ঘরের জন্য ততই ব্যস্ত হয়ে পড়ছে সে। এক তারিখের মধ্যে ঘর ওর চাই। মাঝে মাত্র পাঁচ ছ'দিন সময়। এই ঝোঁকে না বেরোলে হয়তো আর শীগগিরে বেরোনো যাবে না এই মায়ার সংসার থেকে।

অধীরের অফিসে রোজই প্রায় আসছে প্রিয়তোষ। প্রত্যহই একবার করে ঘরের তাগিদ দিচ্ছে সে অধীরকে। অধীর বলেছে, চেষ্টা করছি। আজ সে এসে যথারীতি গুরুদেব ও সুবলবাবুর হাত থেকে রেহাই পাবার পর আসন গ্রহণ করতেই অধীর বলল, একটা সুখবর দিচ্ছি তোমাকে।

—কী রকম ?

—ঘর পাওয়া গেছে একটা।

—কোথায় ?

—আমার বাড়ির কাছেই। —নেবে ?

—নেবো না মানে ? কবে যাবো বলো ঘর দেখতে—

—আজই চলো !

বিকেলের দিকে আজ আর প্রুফ দেখলো না প্রিয়তোষ। অধীরের ছুটির পর ওর সংগেই সোনারপুরে এলো।

হ্যাঁ, ঘর দেখলো। ছোট ঘর। সরু বারান্দা। রান্নাঘর নেই। মাসিক ভাড়া পনেরো টাকা। পরিবেশটা গ্রাম্য। সুবিধার মধ্যে ষ্টেশন পাঁচ মিনিট ও বাজার তিন মিনিটের পথ। অসুবিধার মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় মদের দোকানের কথা। বাড়ির ভিতরে প্রবেশের মুখেই একটি দেশি মদের চোরাই দোকান।

যে সময় প্রিয়তোষ ওরা ঘর দেখতে এলো তখন কয়েক জন খরিদ্দার বসে মদ গিলছে। না, ঘর নেই মাথার উপরে। নেই কোন চালা। উন্মুক্ত আকাশের নিচে পথের মাঝে মাদুর পেতে বসে দোকানদারি চলছে। দোকানদারকে ঘিরে গোল করে বসে দশ বারো জন। সবার হাতেই একটি করে গেলাস।

তাছাড়া, বাড়িটার মধ্যে আরও ক'ঘর ভাড়াটে আছে। একটি পরিবারের ঝি' গিরি করে স্ত্রী আর স্বামী দিন মজুর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোন অফিসের বেয়ারা। একজন বাঙালী একজন জাতিতে উড়ে। পরিবেশটা মোটেই ভদ্র নয়। অসুবিধাটা বড় নয়। প্রিয়তোষ তার ঘরে পড়ে থাকবে। সদরের মুখের ওই মদের ব্যবসাটি বড়ই দৃষ্টিকটু।

বাড়িউলিকে এ অসুবিধার বিষয় জানাতে তিনি বললেন, তা' ওরা বাইরে বসে খায়—কিন্তু আমার বাড়ির ভেতর কেউ ঢুকতে সাহস করে না।

অধীর জিজ্ঞেস করলো, কী করবে—চলবে এ ঘর ?

কম পয়সায় বিশেষ করে একা পুরুষ মানুষের পক্ষে ঘর পাওয়া মুস্কিল। এ সুযোগ ছাড়লে দ্বিতীয়টি মিলতে অনেক দেরি হতে পারে। তাই রাজি না হয়ে উপায় ছিল না প্রিয়তোষের। সে আর একবার ঘরে ঢুকলো।

পুব মুখো ঘর। পশ্চিমে একটি জানালা। কাঠের গরাদ—পাল্লা নেই। ভাঙাটিন, পিজবোর্ড দিয়ে বাঁশের বাতা বাঁধা আছে দড়ির। বলল, এ জানলাটাতো খোলা যাচ্ছে না। তা' এটা ঠিক করে দেবেন তো ? পুব দিকেও আর একটা জানলা আছে বারান্দার উপরে। সেটারও একই অবস্থা প্রায়। তবে তিনটি পাল্লা আছে এর। প্রিয়তোষ এ জানলাটার কথাও বলল।

বাড়িউলি বলল, তুমি এসোতো আগে—তারপর সব ঠিক করে দেওয়া যাবে। এ ঘরে আমার যে ভাড়াটে ছিল সে আমার এক মাসের ভাড়া মেরে রাতের বেলায় পালিয়েছে। তাই আর কিছু করিনি।

রান্নার ব্যবস্থার কথা হলো এর পর। ঠিক হলো ঘরের সামনের বারান্দার তিন দিকে তিনটি বেড়া দিয়ে ঘিরে রান্নার জায়গা এবং বিপরীত দিকে আর একটি বেড়া দিয়ে পাশের ঘরটি থেকে এ ঘরটি সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হবে।

ভাড়ার কিছু অংশ আগাম দিয়ে ষ্টেশনে এলো প্রিয়তোষ। অধীর এলো ওকে তুলে দিতে।

বলল, হঁ্যা, চলে এসো—বেরিয়ে পড়ো বাড়ি থেকে। কী হবে ওখানে পড়ে থেকে। এখনই বেরিয়ে পড়ো, এরপরে নাহ'লে আপশোষ করতে হবে।

কথাটিকে ঠিক মেনে নিতে না পারলেও প্রতিবাদ জানাতে পারলো না প্রিয়তোষ। ট্রেন ছেড়ে দিল।

সোনারপুর থেকে ক্যানিং। চল্লিশ মিনিটের পথ। সময়টুকু কখন কেটে গেল বুঝতে পারলো না প্রিয়তোষ।

জানালার ধারে একটা সীট পেয়েছিল সে। সময়টা শীতকাল হলেও জানালা খুলেই রেখেছিল সে। তন্ময় হয়ে গিয়েছিল ভাবনায়।

নানা ভাবনা। অর্থনৈতিক দিকটাই প্রধান। নির্দিষ্ট কোন আয় নেই তার। ঘুরে ঘুরে প্রুফ দেখার কাজ—সব সময় কাজ থাকে না। কাজ না থাকলে আয় থাকে না। এদিকে ঘরতো সে নিল।

বাড়িতে যদিও এ মাসের বরাদ্দ পঞ্চাশ টাকা পুরো দেওয়া হয়ে গেছে তবু অনেক টাকা দরকার নতুন বাসায় গেলে। কিছু কেনাকাটা দরকার। কালকেই মানথ্‌লি রিনিউর তারিখ। পাঁচ ছ'দিন এখনও ক্যানিংএ থাকতে হবে। অতএব টাকাটা খরচ করতেই হবে। অবশ্য সামনের মাসের ঐ তারিখ পর্যন্ত যাতায়াত করা যাবে এতে—কিছু কিছু করে জিনিষপত্র আনা যাবে এতে—কিছু কিছু করে জিনিষপত্র আনা যাবে রবিবারে রবিবারে।

যাইহোক, অন্যদিনের চেয়ে একটু আগেই বাড়ি ফিরলো আজ প্রিয়তোষ।

মা খুশি হলেন। বললেন, এইতো ঠিক ফিরেছিস, রোজ এমনি ফিরলে কোন গণ্ডগোল থাকে না। যা, হাত-মুখ ধুয়ে আয়—তোদের খেতে দিয়ে বৌমা খাবে।

নীরবে মায়ের আদেশ পালন করলো প্রিয়তোষ প্রায় সংগে সংগেই। তারপর একসময় খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লো মায়ের পাশেই সুবোধ বালকটির মতো। নতুন আশায় মনটা অনেকটা ভরে আছে আজ। অতএব সহজেই নিদ্রা এসে গেল। এবং তা আজ জমে উঠলোও বেশ।

পরদিন উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল তাই। হোক—সকালে খুব তাড়া নেই তার। বেরোয় সে সেই দশটা পঞ্চাশের ট্রেনে। অন্যদিন প্রাতঃরাশ সেরে একটু পড়াশোনা করে নাহলে প্রুফ দেখে। আজ কিছুই হলো না। যথারীতি চা খেয়ে আবার শুয়ে কাটালো খানিকটা তারপর সময় হয়ে যেতেই স্নানে গেল।

সাড়ে ন'টায় স্নানে যায় প্রিয়তোষ। দেবতোষ তো সকাল সাতটায় চা খেয়েই বেরিয়ে যায়। দুপুরে ফেরে সে বাড়িতে খেতে। একটু বিশ্রাম করে আড়াইটে-তিনটে নাগাদ আবার বেরোয়।

একমাত্র ছোট বউ অতসী ছাড়া আর কারোর অফিসের ভাতের তাড়া নেই সকালের দিকে। ঘুম থেকে উঠে তাই অতসী চা করে ভাত বসিয়ে দেয়। তারপর মাছটুকু রান্না করে স্নানে যায়।

ওদিকে মায়ের পুজো-আহ্নিক হয়ে যায় ততক্ষণে। তিনি এসে এরপর রান্নাঘরের হাল ধরেন। শাক চচ্চড়ি তরকারী ভাজা-ভুজি নিয়ে বারোটা পর্যন্ত বসে রাঁধেন।

প্রিয়তোষের খাবার সময় ও মায়ের রান্না চলে। সেজন্য তিনি প্রায়ই অনুযোগ করেন, এটা হলো না ওটা করতে পারলাম না ইত্যাদি বলে।

প্রিয়তোষ বলে, তাতে কী হয়েছে—রেখে দিও, রাতে এসে খাবো।

মা' তাই করেন। শাক-পাতা দিয়ে নানারকম রান্না তার জন্যে সাজানো থাকে প্রায়ই রাতে।

আজ খেতে বসে মায়ের জন্য দুঃখ হচ্ছিলো প্রিয়তোষের। ক'দিন পরে এই স্নেহ এমনি পঞ্চ ব্যঞ্জন রন্ধন করে খাওয়ানো তার কোথায় থাকবে। তাকে চলে যেতে হবে—না গিয়ে উপায় নেই। লেখার মতো পরিবেশ বা সুযোগ এ বাড়িতে নেই।

অথচ, তারও এমন টাকা উপার্জন করবার ক্ষমতা নেই যে এ পরিবারটাকে অন্য কোথাও সে তুলে নিয়ে যাবে।

কেন যে তার লেখক হবার সাধ হ'লো, যদি সে আর পাঁচজনের মতো এ চিন্তা নিয়ে সময় পরিশ্রম নষ্ট না করে অর্থের চিন্তা করতো তা'হলে কি সেও পারতো না একটা বিয়ে করে মা'কে সুখী করতে—নিজে সুখী হতে ? চেষ্টা যে সে না করেছিল তা'ও তো নয়।

কতবারই তো সে লেখা ছেড়ে দেবার সংকল্প নিয়েছিলো এবং বন্ধ করেও দিয়েছিলো সব। কিন্তু কী যে হয়, যেমনি দু'টো পয়সা আসে হাতে কিম্বা একটু কেউ প্রশংসা করে লেখার ব্যাপারে অমনি সাধটা আবার প্রবল হয়ে ওঠে।

অনেক ভেবে দেখেছে প্রিয়তোষ লেখা ছাড়া তার দ্বারা হবে না। সে ছাড়লেও লেখা ছাড়বে না তাকে। ওকে নিয়েই কাটাতে হবে তাকে সারা জীবনটা। যদিও লেখা তাকে কিছুই দেয়নি এখনও তবু ওকে নিয়েই থাকতে হবে তাকে—হ্যাঁ, থাকতেই হবে। এই তার ভাগ্য, এই তার বিধিলিপি।

অনিলবাবু যে টিউশানির সন্ধানটা এনেছিলেন, ওটা হলে চিন্তা ছিল না। দিব্যি লেখা পড়ায় মন দেওয়া যেতো। কিন্তু ভদ্রলোক দেখাই করলেন না আর। হয়তো মত নেই তাঁদের। না থাক, ভালই হয়েছে। পরের বাড়ি সম্পূর্ণ পরের মধ্যে গিয়ে সব সময় পরের মুখ চেয়ে থাকলে হয়তো লেখা না হতেই পারতো।

ওর থেকে একটি ছোট বাসা অনেক প্রয়োজনীয় এবং অনেক স্বস্তিকর। হ্যাঁ, তা সে পেয়েছে—এখন কিছু অর্থ উপার্জন দরকার। বাঁচবার প্রাথমিক প্রয়োজন কোন রকমে মেটানো গেলে আর চিন্তা থাকবে না। হয়তো ভুল করছে প্রিয়তোষ। তবু উপায় নেই ওর ভুল না করে?

মা খেতে দিতে দিতে একবার বললেন, চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছিস্ কিছু?

জবাব দিলো না প্রিয়তোষ। জীবনে বহুবার মায়ের এমনি প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। নীরবে খেয়ে চলল তাই।

মা আবার বললেন, এমনি আর কতদিন চলবে—বলি বয়েস বাড়ছে না কমছে। এখন বয়েস আছে বুঝ্‌ছো না—শেষ বয়েসে কে দেখবে তোকে?

প্রিয়তোষ বুঝলো মা সেই পুরোনো ইঙ্গিত করছেন। অর্থাৎ বিবাহের বিষয় বলছেন। হয়তো তাঁর দুশ্চিন্তা অর্থহীন নয়। তবু তার পক্ষে কি করে সম্ভব ওদিকের বিষয় ভাবা। নিজের বিড়ম্বিত জীবনের বোঝা বইতেই সে অক্ষম তার উপরে আর একজনের ভার নেবার সামর্থ তার কোথায়?

আজ মা ধৈর্য হারা হয়ে উঠলেন, আমি কিন্তু আর শুনবো না—এবার যা হোক একটা ঠিক করতেই হবে। একজনের বিষয় নিশ্চিন্ত হয়েছি এবার তুই একটা বিয়ে করলে দু'জনকে দু'টো সংসার করে দিয়ে নিশ্চিন্তে মরতে পারি আমি। আমাকে আর দুঃখ দিস্ না। আমি বলছি এবার বিয়ে কর – ভাগ্যে থাকলে বিয়ে করেও লেখা যায়।

কিছুই জবাব দেবার নেই প্রিয়তোষের। নীরবে আহার পর্ব সমাপ্ত করে বেরিয়ে পড়লো সে কোলকাতার উদ্দেশ্যে। মা রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে বললেন, আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস্।

সেই দশটা পঞ্চাশের ট্রেন্। অনেকেই এ গাড়ির নির্দিষ্ট যাত্রী। সবার মুখ চেনা। কিন্তু প্রিয়তোষ সে সব কামরায় ওঠে না। কারণ, পাছে বক্‌বক্ করতে হয় বা তাসের আড্ডায় যোগ দিতে হয়।

গাড়িতে উঠে বকর বকর কিম্বা তাস খেলে হৈ-হৈ করে সময় কাটিয়ে দেওয়া বরদাস্ত করতে পারে না সে। চুপ-চাপ বসে বাইরের দৃশ্য দেখো, বসবার জায়গা না পেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবো এই তার মত। তাই সম্পূর্ণ পরিচিত হীন একটি কামরায় উঠলো সে। হ্যাঁ, বসবার জায়গাও পেলো একটু।

আজ যেন বড় ক্লান্ত সে। কেন যেন চোখ দু'টো বুঁজে আসছে। এই অবস্থাতেই সে ভেবে চললো অনেক কিছু। ক'দিন পর থেকে সে সোনারপুরের বাসিন্দা হবে। এখনও বাড়িতে কিছু বলা হয়নি। না, আগে থেকে কিছু বলা হবেনা—একেবারে যাবার সময়েই সবাই জানবে তাহলে আর বাধা দেবার জন্ম প্রস্তুত থাকবে না কেউ।

এখনও ছ'টা দিন—এ ছ'দিন এখন ঠিক মতো কেটে গেলেই হয়। সংসারের মায়ায়, সুখের নেশায় অথবা ভবিষ্যতের ভয় বা ভাবনায় যেন দুর্বল হয়ে না যায়। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে না—দুর্বল মানুষ কিছুই করতে পারে না জীবনে।

ছ'টা দিন কেটে গেল দেখতে দেখতে। এ ছ'টা দিন দারুণ অস্বস্তির মধ্যে কাটলেও হতাশ হয়নি প্রিয়তোষ। যাবার সংকল্পে অটল আছে সে।

আজ রবিবার। বছরের, মাসের শেষ। আগামী কাল পয়লা জানুয়ারী। চলে যাবার কথা তার।

কিন্তু পকেটে মাত্র গোটা পনেরো টাকা সম্বল। এক সপ্তাহের মধ্যে আর কোথাও কিছু পাবার সম্ভাবনাও নেই। দশটাকা বাড়িওয়ালাকে দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে। বাকি থাকবে পাঁচ টাকা।

এক সপ্তাহের খাওয়া-দাওয়া বাজে খরচা বা হাত খরচা সব চালাতে হবে এর মধ্যে। যদিও একদিন ঠিক মতো চলা যায় না এতে তবুও এতেই সাত দিনের ব্যবস্থা করে নিয়ে আগামী কাল সকালেই সে বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকলো।

বাড়ির অন্য কারোর জন্য চিন্তা নেই। কিন্তু যাবার সময় মাকে কী বলে যাবে তাই নিয়ে চিন্তায় পড়েছে প্রিয়তোষ। শিল্পী হলেও, সেও সাধারণ মানুষ। রক্ত মাংসে গড়া দেহ তার অজস্র মায়ার বন্ধনে বাঁধা।

শুয়ে বসে সারাটা দিন কাটলো। অবশেষে সন্ধ্যা হলো। রাতটুকু পোহালে বিদায় নেবার পালা।

এখনও কাউকে কিছু বলা হয়নি। এমনকি সাধারণ তৈজস্ পত্র ইত্যাদি গুছিয়ে নেওয়া পর্যন্ত হয়নি। যা হয় কাল সকালে হবে ভেবে মায়ের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো সে।

হঠাৎ ওর দিদি অনুরাধা এসে হাজির কোলকাতা থেকে। মাকে

দেখতে। সংগে এসেছে তার দু'টি মেয়ে সোনা আর রূপো। ছয় আর আট বছরের এই দু'টি মেয়েই দিদির সব। ছেলে নেই—ভবিষ্যতে আর হবার সম্ভাবনাও নেই বিজ্ঞানের কল্যাণে।

তাই অনুরাধা যেখানেই যায় মেয়ে দুটিকে সংগে নিয়েই যায়। ওরা তার নয়নের মণি।

অনুরাধা প্রিয়তোষের চেয়ে সামান্যই বড়। বছর দেড়েকের ব্যবধান দু'জনের মধ্যে। এই সামান্য বয়সের ব্যবধান হলেও পদমর্যাদায় সে যে বড় সে কথাটা গর্বের সংগে বলে বেড়ায় অনুরাধা। প্রিয়তোষের সংগে ভারিক্কী চালে কথাবার্তা বলে সে দিদিগিরি ফলায়।

ঘরে ঢুকেই ওকে শুয়ে থাকতে দেখে সে বলে উঠলো, কিরে ছোঁড়া, সন্ধ্যে বেলায় শুয়ে আছিস্ কেন—শরীর খারাপ করেনি তো?

—আরে তুই! আয় আয়—সোনা রূপো কই?

সোনা রূপো পাশের ঘরেই ছিল। বড় মামার সাড়া পেয়ে দু'জনে এসে দু'হাত জড়িয়ে ধরলো ওর। বড়মামার সংগেই খাতির ওদের বেশি। আদর-আব্দার বায়না ইত্যাদিও এই বড় মামারই কাছে। অতএব, মামা বাড়ি এসে বড় মামাকে না পেলে ওদের মুখ কালো হয়ে যায়। এহেন বড় মামাকে পেয়ে একজনে ঘাড়ে চাপলো আর একজনে গল্প শোনার বায়না ধরে বসলো।

অনেক রাত পর্যন্ত ভাগ্নীদের নিয়ে কাটলো প্রিয়তোষের। সন্ধ্যাবেলায় অনুরাধারা আসায় নতুন করে রান্নার পাঠ শুরু হলো। দেবতোষ ফিরে বাজাবে গেল। তাই খেয়ে-দেয়ে শুতে একটু দেরিই হয়ে গেল সবার।

কিন্তু প্রিয়তোষের একটু সুবিধে হয়ে গেল এতে। অর্থাৎ, শোবার জন্যই এই সুবিধে। এক মেয়ে নিয়ে অনুরাধা মায়ের বিছানা দখল করলো। আর এক মেয়ে গেল দেবতোষের বিছানায়। প্রিয়তোষের শোবার ব্যবস্থা হলো বাড়িওয়ালার ভাঁড়ারে। আলাদা বিছানার ব্যবস্থাও হলো একটা আজ তার জন্যে।

এ সুযোগ গ্রহণ করলো প্রিয়তোষ। রাতের মধ্যেই সে বাড়িওয়ালার ভাঁড়ার খুঁজে খানিকটা কাতা দড়ি জোগাড় করলো। তারপর শুয়ে পড়লো। ঘুমুতে চেষ্টা করলো।

সারারাত ভাল ঘুম না হলেও রাত এক রকম কেটে গেল। ভোর ভোর উঠে রাতের সংগৃহীত দড়ি দিয়ে বিছানাটা বেঁধে রাখলো প্রিয়তোষ। তারপর দরজার শিকল তুলে দিয়ে মায়ের ঘরে এসে উঠলো।

মা উঠে গেছেন—অনুরাধাও উঠে গেছে। দু'জনারই সকালে ওঠা অভ্যাস। সে বসে গেল ভাগ্নীদের আসরে।

ঠিকে ঝি এসে যথা সময়ে বাসন মেজে উনুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে। অতসী অন্যদিনের থেকে একটু সকালেই উঠেছে আজ। মা সকাল বেলার পুজো-আহ্নিক বাদ দিয়ে রান্না ঘরে ঢুকেছেন। গতকাল রাতেই বলে রেখেছিল প্রিয়তোষ আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরোবার কথা।

চা খেতে খেতে অনুরাধা সেই প্রশ্নই করলো এখন, তাড়াতাড়ি বেরোবি আজ কেন ?

—কাজ আছে।

—কী কাজ ?

—সোনারপুরে নামবো একটু যাবার সময়।

—কেন ?

—ওখানেই থাকবো এবার থেকে। একটা ঘর নিয়েছি।

প্রিয়তোষের এই চলে যাওয়ার ব্যাপারটা নতুন নয়। ইতিপূর্বে কয়েকবারই চলে গেছে সে সংসার থেকে। তবু এরকম আকস্মিক নয় কোন বারই।

অনুরাধা তাই সখেদে বলল, পাগলামী চেপেছে আবার বুঝি ঘাড়ে—ও সব খেয়াল বাদ দে। যেমন আছিস্ তেমন থাক এখানে।

মা কাছেই ছিলেন। কথাটা শুনে তিনি হয়তো বিস্মিত হলেন না। একবার শুধু বললেন, ক'দিন থেকেই দেখছি তাই কেমন কেমন ভাব। তা—কর তোর যা খুশি। এই বুড়ো বয়েসে আমাকে আর না জ্বলালে যদি তোর না চলে তবে জ্বালা। যেখানে গিয়ে তুই সুখে থাকবি সেখানে যা। আমার আপত্তি নেই—শুধু মাঝে মাঝে খবর পেলেই হবে। আমার কি, একবেলা তু'টো আতপ চাল, তা' পেলেই আমি আর কিছু চাইবো না তোদের কাছে।

অনুরাধা বলল, ওসব পাগলামী রাখ্। দেখলি তো এতদিন ও সব করে—এবার ও সব ছাড়—

—কিন্তু আমার যে ঘব নেওয়া হয়ে গেছে।

—ও, তলে তলে ব্যবস্থা সব হয়ে গেছে!

—হ্যাঁ।

উঠে পড়লো প্রিয়তোষ। বিছানা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল পূর্বেই। একটি রেশন ব্যাগে জনতা স্টোভ একটি, একটি জলের গ্লাস, কয়েকটি পেরেক ইত্যাদি কিছু টুকি-টাকি গুছিয়ে নিলো সে—যা কিনা আজ রাতেই লাগবে নতুন সংসারে গিয়ে। তারপর স্নান করতে গেল।

মা বললেন, একটু দেরি কর—সব রান্না হয়নি এখনও।

—যা হয়েছে ওই দিয়ে খেতে দাও। আমি তো আজই যাচ্ছি না একেবারে। রবিবারে আবার আসছি। আমার মান্থলি আছে এখনও তিন সপ্তাহ। রোববার করে আসবো—খেয়ে যাবো আর জিনিষ পত্র কিছু কিছু করে নিয়ে যাবো।

স্নান করে খেয়ে নিলো প্রিয়তোষ। তারপর জামাকাপড় পরে বেরোলো। স্টেশন পর্যন্ত একটি সাইকেল রিক্সা করা যেতে পারতো। করলো না হিসেব করে। বিছানাটা ঘাড়ে করে রেশন ব্যাগটি হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ন'টা দশের গাড়ি পেয়ে গেল। নামলো এসে সোনারপুরে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। চলে এলো নতুন বাড়িতে।

ঘরে জিনিষ-পত্রগুলো রেখে দরজায় তালা লাগিয়ে অধীরের বাড়ি এলো।

দশটায় আফিস হলেও অধীর বাড়ি থেকেই বেরোয় সাড়ে দশটার পরে। সুখের চাকরি ওদের—এগারো বা বারোটায় হাজির হলেই হলো। অবশ্য আজ ১লা জানুয়ারী ছুটির দিন। হ্যাঁ, দেখা হলো। প্রিয়তোষ বলল, চলে এলাম আজ থেকে।

—ভালো করেছো। তা, বাড়িওয়ালার টাকা দিয়েছো?

—হ্যাঁ।

—দেখো, আমার বদনাম যেন না হয়। যেন আমাকে শুনতে না হয় যে মশাই, আপনার বন্ধু বাড়িভাড়া দেয়নি।

—না, সেরকম হবে না। যতক্ষণ খাওয়া জুটবে, ততক্ষণ ভাড়া আমি ঠিক দিয়ে যাবো। কিন্তু তোমার সংগে অন্য একটা পরামর্শ ছিল।

—কি?

—বাড়িওয়ালা বারান্দায় রান্নার জায়গা ঘিরে দেয়নি। জানালাও দেখলাম সারায়নি।

—দেবে। বলো ভালো করে।

—বলবো কি, আগেই বলা ছিল। এখনও বললাম একবার টাকা দেবার সময়।

অধীরের বাড়ি যাবার আগেই বাড়িউলির হাতে আগামী মাসের অগ্রিম ভাড়া বাবদ বাকি দশ টাকা দিয়ে গিয়েছিলো প্রিয়তোষ। হাতে আর মাত্র পাঁচ টাকা সম্বল। শনিবারের আগে কোথাও টাকা পাবার আশা নেই।

তাই এ সপ্তাহটা যদি অধীরের বাড়ি খাওয়াটা সারা যায় সেই উদ্দেশ্যেই ওকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, এ সপ্তাহটা ভাবছি তোমার বাড়িতে খাবো। অবশ্য এজন্য যা খরচা লাগে দিয়ে দেবো আমি সপ্তাহের শেষে।

প্রিয়তোষ ভেবেছিল অধীর রাজি হয়ে যাবে। বড় মুখ করেই বলেছিল সে তাই। ওদের বন্ধুত্ব অনেকদিনের এবং অনেক গভীর। সেখানে ফাঁক ছিল না বলেই ওর বিশ্বাস ছিল।

কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল ওর ধারণা ভুল। অধীর স্পষ্টই বলল,- না, তা' হয় না। মানে, বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবের ঝামেলা করতে চাই না আমি—দরকার হলে দু'দশটা টাকা ধার নিও আমার কাছ থেকে। খাবার ব্যবস্থা নিজেই করো।

কথাটা অন্য কোন তথাকথিত বন্ধুর কাছ থেকে শুনলে ব্যথা পেতো না প্রিয়তোষ। কিন্তু একজন কবি বন্ধুর কাছে এরকম সে আশা করেনি।

এমনিতে কতবার এসেছে সে অধীরের বাড়িতে। কত যত্ন খাতির থাকবার খাবার জন্য কত অনুরোধ। কিন্তু দরকারের সময় তা' প্রত্যাখ্যাত। তবু অধীরকে তা' বুঝতে না দিয়ে ঘরে ফিরলো।

একটু পরে বেরোলো আবার। আজ ১লা জানুয়ারী হলেও, ওর ছুটি নেই। কলেজ ষ্ট্রীট যেতে হবে। হ্যাঁ, নির্দিষ্ট ট্রেনটা ধরে যথা সময়ে এসে সে নামলো শিয়ালদহ ষ্টেশনে। তারপর হেঁটেই কলেজ ষ্ট্রীট্ চলে এলো।

গুটি তিনেক নির্দিষ্ট পার্টির কাজ করে প্রিয়তোষ। দু'জায়গায় প্রুফ্ থাকবার কথা। না, আসেনি এখনও। এক জায়গায় খবর পেলো আজ কম্পোজ হচ্ছে—আর এক জায়গায় সন্ধ্যের দিকে প্রুফ্ আসবে। সময়টা বসেই কাটাতে হবে। কিন্তু কোথায় বসা যায়। সব জায়গাতেই সিজেন্ টাইমের ভিড়। তবু ওর মধ্যে বসতে হলো সাউদার্ন বুক এজেন্সীতে।

এখানকার মালিক যদুবাবুর সব কাজই প্রায় সে করে। সেই সূত্রেই সম্পর্কটা এখন অনেকটা বন্ধুত্বের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য যদুবাবু এ সুযোগটুকু গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। বন্ধুত্বের অজুহাতে বাজার থেকে দর তিনি কম দেন আর কাজকর্মের এতটুকু ত্রুটি পেলে অতিরিক্ত কথা শোনাতেও ছাড়েন না। তবু প্রিয়তোষের কাছে তিনি পরম ব্যক্তি। এখানে ছাড়া অন্য কোথাও বসার জায়গা নেই।

যদুবাবু সংসারী মানুষ। পূর্বে কোন বইয়ের দোকানে চাকরি করতেন। ক'বছর হলো এই ব্যবসা ফেঁদেছেন নিজে। কপালগুণে অল্প দিনেই ফুলে-ফেঁপেও উঠেছেন একটু। কিন্তু তা' বলে বাজে খরচের ধার দিয়েও যাননা। একটি মাত্র ছোকরা কর্মচারী দিয়েই কারবারটা চালাচ্ছেন। সে ছোকরা এদিক-ওদিক ব্যস্ত থাকে বাইরের কাজে। একা যদুবাবুই সামলান কাউণ্টার। কাজের চাপ বেশি থাকলে প্রিয়তোষ ফাঁক মতো একটু-আধটু সাহায্যও করে তাঁকে। এজন্য যদুবাবু কৃতজ্ঞ নন। তাঁর বক্তব্য এটা তাঁর প্রাপ্য।

যাইহোক, সন্ধ্যের দিকে প্রুফ্ এলে দেখে দিয়ে সোনারপুর ফিরলো প্রিয়তোষ। বাড়ি থেকে হ্যারিকেন নিয়ে এসেছিল একটা— মা তেল ভরে দিয়েছেন—মায় ষ্টোভ্‌টা পর্যন্ত তেল ভর্তি অবস্থায় এসেছে। তাই কেরোসিন কিনতে হলো না।

ঘরে এসে আলো জ্বেলে জামা কাপড় ছেড়ে বাজারে গেল প্রিয়তোষ। বাজার করতে হবে। সম্বল পাঁচ টাকার মধ্যে দু' কেজি চাল, সামান্য কিছু ডাল, মুড়ি, তেল, নুন, কাঁচা লঙ্কা ও চা চিনি কিনে ফেলল।

রাতে খাওয়া হলো না। এক কাপ লাল চা আর একমুঠো মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লো সেদিনের মতো বিছানা পেতে।

ঘরে আলো বাতাস প্রবেশের অ-ব্যবস্থার দরুণ মেঝেটা স্যাঁত-সেঁতে হয়েছিল। বিছানা ভালো নয়—তার উপর ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়ে আসছে শীতের বাতাস। অগ্রাণ মাসের রাত হলেও ঠাণ্ডা বেশ পড়েছে। লেপ গায়ে দিয়েও শীত মানছেনা—নীচ থেকেও ঠাণ্ডা উঠছে।

তবু শীতে বড় একটা কাতর হলো না প্রিয়তোষ। ভবিষ্যতের আশায় মনটা ভরে আছে। এ ঘর সে সাজাবে। আর, এখানে বসে লিখবে সে মোটা মোটা উপন্যাস। একবার বাড়ির কথা, মায়ের কথা মনে হলেও মনে তা' ঠাঁই দিল না সে। কী হবে সুখের কথা ভেবে, কী হবে আপনজনদের ভেবে—ওরা ওদের জন্য, ওর জন্য নয়।

এক সময় কখন যেন সে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে উঠে ষ্টোভে করে চা তৈরি করে খেয়ে ভাত বসিয়ে দিল প্রিয়তোষ। এক মুঠো ডাল ছড়িয়ে দিল চালের মধ্যে। বেশি দেবার উপায় নেই। তাহলে সপ্তাহটা পুরো কুলোবে না ডালে। একটি কাঁচা লঙ্কা, এক ফোঁটা তেল ও একটু নুন। ব্যাস্ পুরো আয়োজন। স্নান করে এসে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে তাই খেয়ে কাজে বেরোলো প্রিয়তোষ। পকেট খালি—বিড়ি খাবার পয়সাটিও নেই। চিন্তাটি ভারাক্রান্ত করে তুলল ওকে। উপায় নেই বদ মেজাজটাকে দাবিয়ে না রেখে। ভাবল, না আর বিড়ি খাবে না। কিন্তু পারলো না। দুপুরের দিকে অধীরের অফিসে গিয়ে হাজির হলো। উদ্দেশ্য দু-তিনটে টাকা ধার করবার। অধীর ভরষা। অথচ চট্ করে চাইতেও পারলো না। অতএব বসলো।

প্রলয়বাবু যথারীতি উঠে এলেন কাছে, বলিয়ে কেয়া বাত হ্যায় ?

উনি ওর সংগে কথাবার্তায় হিন্দীই ব্যবহার করেন বেশি।

প্রিয়তোষ অন্যদিন বেশি গুরুত্ব দেয় না ওঁর কথার। আজ না দিয়ে পারলো না। গম্ভীর ভাবেই বলল, বাত কুছ্ আচ্ছা নেহি।

—কাঁহে ?

—রুপিয়াকা বহুত অভাব।

সুবলবাবু ইতিমধ্যেই চলে এসেছেন আর একপাশে। হাত বাড়িয়ে ওর ডান হাতটা ধরে বললেন, দেখি হাতখানা !

অধীর বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ দেখো তো ভালো করে, আর কতদিন এ ভাবে চলবে ও—মানে, কবে একটা বিয়ে—থা করবে আর আমাদের একদিন ভুরি-ভোজন করাবে ?

সুবলবাবু এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, রুপিয়াকা অভাব আছে না—এসে যাবে টাকা। এখন আসছে কিছু-কিছু, পরে আসবে বেশি।

—কবে ?

—দেরি আছে। এখন কিছু হবে না। দেখি কপাল খানা।

ওঁর দিকে সোজা তাকালো প্রিয়তোষ। সুবল বাবু তা' দেখে নিয়ে বললেন, এখন কিছু দেখা যাচ্ছে না কপালে। তবে, এককাপ চা আর একটা চারমিনার সিগারেট হবে এখন।

ওধার থেকে রামরতন বাবু বলে উঠলেন এ সময়, আজ আর জল পড়বে না পিছনে ?

—না। আজ জল পড়বার সম্ভাবনা নেই।

সকলে হেসে উঠলেন হো-হো করে। কেউ কেউ বলে উঠলেন, সাবাস বেটা—জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত ফোরটোয়েন্টি বাবু জিন্দাবাদ।

সুবলবাবু পাশের ঘরে চলে গেলেন আড্ডা জমাতে। চা দোকানের ছোকরা এসে হাজির হ'লো এ সময়। অধীর ওদের জন্য দু'টো চায়ের অর্ডার দিয়ে বলল, বলো প্রিয়—তারপর খবর কি ?

—আর খবর !

—আমার কিন্তু একটা নতুন খবর আছে।

—কি ?

— বড় পয়সার অভাব।

—সেকি, আমি যে কিছু ধার চাইবো ভেবেছিলাম আজ তোমার কাছে ?

—কত ?

— তিনটে টাকা দাও না—শনিবার টাকা পেয়েই দিয়ে দেবো।

—কোথায় পাবো ? একটু আগে অফিস থেকে ধার করেছি পনেরো টাকা—এক টাকা দিতে পারি।

গতকালই অধীর বলেছিল দরকার হলে দশ টাকা ধার নাও আমার কাছ থেকে। কথাটা মনে হলেও তা' চেপে রেখে প্রিয়তোষ

বলল, অন্ততঃ দুটো টাকা দাও। নতুন সংসার পেতে মুস্কিলে পড়ে গেছি—কিছু কেনা-কাটা করতে হবে।

—এক টাকার বেশি দিতে পারবো না। নেবে?

—দাও।

হাত পেতে টাকাটা নিলো প্রিয়তোষ।

অধীর বলল, তা'বলে চাইতে যেন লজ্জা করো না। দরকার হলেই চাইবে। আমার পকেটের টাকা মানেই তোমার টাকা—যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই পাবে।

অধীরের অফিস থেকে বেরিয়ে বইয়ের পাড়ায় এলো প্রিয়তোষ। যে যে ঘরে সে প্রুফ্ দেখে সব ঘরে একবার করে ঘুরে শেষ পর্যন্ত সাউদার্ন বুক এজেন্সীতে এলো আবার।

এখানে ছাড়া অন্য কোথাও তেমন আলাপ জমাতে পারেনি সে। সব জায়গাতেই কাউন্টারের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রুফ্ থাকলে নিয়ে আসে—অধীরের অফিসে বসে, না হ'লে সাউদার্নে বসে দেখে আবার দিয়ে আসে। শুধু এখানেই কেমন করে যেন একটু জমে গেছে।

প্রুফ্ কোথাও আসেনি। দু'জায়গায় সন্ধ্যার পর আসবার কথা। অতএব সময়টা এখানেই কাটাতে হবে। বসলো ভিতরে গিয়ে।

যদুবাবু, বললেন, বসে থেকে কী করবেন, যাননা একবার হাঁটতে হাঁটতে প্রেসের দিকে—প্রুফ্‌টা ওখানে বসেই দেখে দিয়ে আসুন না। মাধব গেছে পোষ্ট অফিসে একগাদা রেজিষ্ট্রী নিয়ে—ফিরতে দেরি হবে। তাছাড়া, সে এসে দপ্তরী বাড়ি যাবে। অনেক রাত হবে। ওর থেকে আপনি গিয়ে দেখে আসলে সন্ধ্যের দিকে ওটা মেক্‌আপ পেয়ে যেতে পারেন।

—কিন্তু এতদূর আবার যাবো।

—ও রকম করলে আপনাকে প্রুফ্‌ দেওয়া যাবে না। কেন, প্রেসে গিয়ে প্রুফ্‌ দেখলে আপনার অসম্মান হবে?

—না, ঠিক তা' নয়।

—তবে?

—না, কিচ্ছু না—যাচ্ছি!

উঠলো অধীর।

ইচ্ছে না থাকলেও চলতে হলো প্রেসের দিকে। মনে মনে যদুবাবুর অন্যায় আব্দারের উপর রাগ হলেও, প্রতিবাদ করবার সাহস ওর নেই। পয়সা নিয়ে প্রুফ্‌ দেখে সে সত্য কিন্তু প্রেসে গিয়ে প্রুফ্‌ নিয়ে আসতে দিয়ে আসতে সে বাধ্য নয়। তবু যদুবাবুর এ আদেশ মাঝে মাঝে পালন করতে হয় তাকে—না'হলে কাজ দেবেন না তিনি। অবশ্য পয়সা যদুবাবু সবার চেয়ে কম দেন। তা'হলেও একমাত্র তাকে দিয়েই সব প্রুফ্‌ দেখান ভরসা এই যা।

প্রেসে এসে শুনলো এখনও কম্পোজ হয়নি। আবার হাঁটতে হাঁটতে আসতে হলো সেই সাউদার্নে। ওর আসনটি ততক্ষণে এক খরিদ্দার ভদ্রলোক দখল করেছেন। বই কিনতে এসে গল্প জমিয়েছেন ভদ্রলোক।

প্রিয়তোষকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকতে হলো ভিতরে। মাঝে মাঝে খরিদ্দার সামলাতে হলো কাউন্টারে। এ ভাবে সন্ধ্যে হলো।

মাধব ফিরলো। নানারকম বাইরের ঝামেলা তার। তার উপর ভিতরের কাজ তো আছেই। রাত হয়ে যাচ্ছে। তবু ওকে প্রেসে যেতে বলতে পারার কথা প্রিয়তোষের নয়। যদুবাবু যতক্ষণ না আদেশ করবেন ততক্ষণে সে যেতে পারবে না। ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে তাতে কার কি এসে যায়?

রাত আটটার সময় যদুবাবুর খেয়াল হলো প্রিয়তোষের কথা। মাধবকে বললেন, যাও তো একবার প্রেসে।

যাই-যাই করে আরও ক'মিনিট দেরি করে বেরোলো মাধব।

প্রিয়তোষের শরীরটা ক্লান্ত। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছে দেহটা। টিফিনের পয়সা ছিল না।

অধীরের অফিসে চা বিস্কুট হয়েছিল একবার—সকালে খাওয়াটাও প্রয়োজনমত হয়নি।

তাই ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুঁজে আসছিল। অথচ ওঠবারও উপায় নেই।

এখন যদি সে চলে যায় যদুবাবু কাল দশটা পর্যন্ত প্রুফ্ রাখবেন না—হয় রাতে বাড়ি নিয়ে গিয়ে মাধবকে দিয়ে দেখাবেন রাত এগারোটার পরেও, নয় অন্য কাউকে দিয়ে দেবেন।

সে একাধারে স্তূপ করা বইয়ের পাহাড়ের ধারে মেঝেয় বসে ওই পাহাড়ে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজলো। মাধবের কথা মনে হতে লাগলো ওর আজ অকারণেই।

হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে যদু বাবুর এখানে এসে কাজে ঢুকেছে মাধব। বাড়িতে খাওয়া থাকা আর মাসিক হাত খরচ কুড়ি টাকা তার পারিশ্রমিক।

উদয়াস্ত খাটুনি—শনিবার, রবিবার বা ছুটি-ছাটাও বাদ নেই। যদি নেহাত ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ না থাকে বাড়ির বাগানে খাটাবেন ওকে যদুবাবু।

গ্রামের ছেলে মাধব—গ্রামেই বাড়ি। সব কাজ জানে সে এবং করেও।

কালে-ভদ্রে বাড়ি যায়—তা'ও বাবা-মা'র বিশেষ চিঠি পেলে। নাহ'লে যাবার নামও করে না। এই সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কেন এত খাটে সে। বুদ্ধির অভাব—বিদ্যার অভাব? না, শ্রমের অভাব।

বিংশ শতাব্দীর এই সাতের দশকে শ্রম নেই পশ্চিমবঙ্গে। চারিদিকে হাহাকার—ঘরে-ঘরে বেকার। ফুটপাতে প্রায়ই দু'টো একটা অনাহারী জীবনের অকালে জীবনলীলা সংবরণের দৃশ্যও চোখে পড়ে পথিকের।

রাজনৈতিক কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন সমস্ত দেশের ভাগ্যাকাশ।

দলে দলে হানাহানি—জায়গা-জমি দখল—মিছিল, ধর্মঘট আর লুঠতরাজ ও নারী লুণ্ঠনের খবর চারিদিকে।

এর মধ্যে চোদ্দদলের যুক্ত একটি সরকারও রয়েছে দেশে। তবে তা' সাক্ষী গোপালের মতোই, রয়েছে—রয়েছেই।

নিজেদের দলের পুষ্টি বৃদ্ধি, স্বার্থ সাধন ও বক্তৃতা ছাড়া যেন তাদের আর কোন কাজ নেই।

মানুষ আজ আর মানুষ নয়। দয়া-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এমনকি সাধারণ মানবতার ধার দিয়েও সে আজ যায় না। যে যেদিকে যাকে পারছে তাকে ঠকাচ্ছে। মালিক কর্মচারীকে, কর্মচারী মালিককে, ব্যবসায়ী খরিদ্দারকে, খরিদ্দার ব্যবসায়ীকে, বন্ধু বন্ধুকে ভাই ভাইকেও ঠকাতে আজ তৎপর।

এর মধ্যেও চলছে কৃত্রিম সভ্যতা ও নড়বড়ে সমাজ ব্যবস্থা। মাধব বুঝেছে এসব। ধন্য ওর ধৈর্য্য—টিঁকে আছেও ঠিক। হ্যাঁ, অধীরও থাকবে টিঁকে।

যদুবাবুর এখানে মাঝে মাঝে চা আসছে—এলে কি হবে, সারাদিনে ওর জন্য বরাদ্দ এক কাপেব বেশি চা ভদ্রতার খাতিরেও ব্যয় করার মতো অমিতব্যয়ী যদুবাবু নন।

তবু চা দোকানের ছোকরা কাপ নিতে এলে কাপ প্লেটের শব্দে চোখ খুলে যদুবাবুকে উদ্দেশ্য করে প্রিয়তোষ বলল এক সময়, কি মশাই, চা খাওয়াবেন আর এক কাপ?

—কেন?

—আপনার জন্যই বসে আছি এত রাত পর্যন্ত।

—এমনি কি বসে আছেন, পয়সা নেবেন না আপনি—মুফ্‌তসে খাটবেন!

—না। তবে—

প্রিয়তোষ থেমে গেল। বাইরের লোক এখন আর কেউ নেই দোকানে।

যদুবাবু বললেন, ছাড়ুন মশাই, কিছু পয়সা ছাড়ুন। এখান থেকে আয় করে নিয়ে যাবেন রোজ, এক পয়সা খসাবেন না তা' হবে না আর। কাজ পেতে গেলে খরচ করতে হবে কিছু।

আজ অধীর খরচ করেনি কিছু। অন্যদিন সে একটানা ওঁর সিগারেট জুগিয়ে গেলেও যদুবাবু তাকে খরচ বলে ধরেন নি কোনদিন।

অধীরের কাছ থেকে ধার করে আনা টাকাটি এখন সে বার করে দিল যদুবাবুর হাতে।

বলল, দু' কাপ চা আর দু'টো সিগারেট-এর অর্ডার দিন।

যদুবাবু এ সময় নিজের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে আবার প্যাকেটটি পকেটে রাখলেন। তারপর চা দোকানের ছোকরাটিকে অধীরের টাকাটি দিয়ে বললেন, এই, দু টো চা আর দু'টো চারমিনার নিয়ে আসবি। এই নে পয়সা— তিরিশ আর ছয় কেটে বাকি পয়সা ফেরত দিয়ে যাবি একবারে।

ছোকরাটি চলে গেল।

গল্প করে আড্ডা দেবার ব্যক্তি যারা এখন তারা কেউ নেই। যদুবাবুর সামনের আসনটি খালি ছিল। মেঝে থেকে উঠে প্রিয়তোষ এবার সেই আসনটি দখল করে বলল, কী রকম বাজার আজ?

—আর বাজার! ' এখন সিজেন টাইম, জানুয়ারীর প্রথম— সারাদিনে বিক্রী তিনশ' টাকার মতো। গত বছরে এমন দিনে হাজার বারোশ' টাকা পর্যন্ত বিক্রী ছিল। আরে মশাই, গত বছর লোকে বলেছে, ইলেকসান হচ্ছে—জলপাইগুড়ির বন্যা ইত্যাদির জন্য বাজার মন্দা। এবার যে তার চেয়েও খারাপ। আসলে গত বছর ইলেকসান হলেও লোকের হাতে কাঁচা পয়সা ছিল—এবার নেই। দেখুন না, আরও কি হয়! না, ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে না আর। পাওনাদারদের দেবো কি, আর বাড়িতেই বা নেবো কি!

—তা ঠিক, বাজারটা যেন দিন-দিনই কেমন হয়ে যাচ্ছে। আসলে লোকের হাতে পয়সা নেই, চারদিকে কল-কারখানা সব বন্ধ—

তাই। তা'ছাড়া, সামনে সরস্বতী পুজো—ছেলেরা বই কেনার চেয়ে পুজোর দিকে এখন ব্যস্ত। সামনের মাসে উঠবে বাজার।

—আর উঠবে মশাই! আমি বলে দিচ্ছি দেখবেন, আর উঠবে না। চাকরি করে তবু বাড়িটা করেছিলাম—না হলে আজ করতে পারতাম? দশ বছর ব্যবসা করে কি করলাম—বাড়িতে খাটা পায়খানা; একটা পাকা পায়খানা পর্যন্ত করতে পারলাম না আজও।

পাকা পায়খানা করতে না পারার মতো অবস্থা যদুবাবুর নয়। প্রিয়তোষ জানে না তাঁর বাড়িতে পায়খানা কাঁচা কি পাকা। আসলে যদুবাবু হিসেবী-লোক।

ব্যবসা যতই মন্দা হোক মাসে মাসে বই ঠিক বার করছেন নতুন—নতুন—দ্বিতলকে ত্রিতল এবং পাল পার্বন ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ সব চালিয়ে যাচ্ছেন।

তবু ওঁর কথা মেনে নিয়ে বলল, আরে মশাই, একটা পাকা পায়খানা করতে কত আর খরচ—তুই কি আড়াই হাজার বৈ তো নয়, ও আপনি ইচ্ছে করলেই করতে পারতেন।

যদুবাবু হয়তো এবার বুঝলেন প্রিয়তোষের কাছে বেশি বাজে কথা বললে ধরা পড়ে যেতে হবে। দীর্ঘদিনের আলাপে ওঁর নাড়ী-নক্ষত্র প্রায় সবই সে জানে।

সুর পালটিয়ে তাই তিনি বললেন, আরে মশাই, পায়খানা তো করবো—আগে কি খেয়ে পায়খানা করবো তার জোগাড় করতে হবে না?

—ঠিক—ঠিক।

হেসে উঠলো প্রিয়তোষ।

চা এলো এসময়। এক হাতে কাপ আর হাতে ফেরত চৌষট্টি পয়সা পকেটে রাখতে রাখতে সে ভাবলো ছত্রিশ পয়সা খরচ না করলেই হতো।

মাধব ফিরলো একটু পরে।

রাত এখন প্রায় ন'টা। না প্রুফ্ আনে নি সে। প্রেস বলেছে

কম্পোজ হয়নি। তা' এতক্ষণ বসে সে করছে কি—অনেক আগেই ফিরতে পারতো মাধব। না, কিছু বলবার উপায় নেই ওকে। তা'হলে যতুবাবু হয়তো বলবেন, কেন বসলেন কেন, চলে গেলেই পারতেন—প্রুফ্ আমি অন্য লোক দিয়ে দেখাতাম।

প্রিয়তোষ উঠলো। আর এক জায়গায় এলো। তাঁদের বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে। এখানেও হলো না কাজ আজকে। তৃতীয় জায়গায় অবশ্য একটা ফর্মা পাওয়া গেল। তা' নিয়ে শিয়ালদা অভিমুখে রওনা হলো সে এবার।

এখন ট্রেন নেই আর সোনারপুরের। নটা পঁয়ত্রিশের সময় হয়ে গেছে। যেতে যেতে ছেড়ে দেবে।

পরের ট্রেন সাড়ে দশটায়। ধীরে-ধীরে হাঁটতে-হাঁটতে এবং আরও কিছু ভাবতে ভাবতে চলল সে। এই তার জীবন—সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট।

তবু একটা চাকরি কোথায় পাবে সে—কোথায় পাবে আয়ের একটা নির্দিষ্ট পন্থা।

দেশে আজ এ ব্যাপারটা যে স্বপ্নের চেয়েও অলীক, মৃত্যুর চেয়েও বিভীষিকাময়।

বাঁচতে হবে, এর মধ্যে তবু বাঁচতে হবে মানুষকে। কেন মানুষ আজ এত অসহায়। সুখের জন্য, শান্তির জন্য, প্রগতির জন্য সে বিজ্ঞান এনেছে—সে বিজ্ঞান কি তবে মিথ্যে, ভুয়ো—কাগজের উপর কালির আঁচড় মাত্র!

এগারোটার মধ্যে সোনারপুরে পৌঁছবার কথা। ফিরতে তবু সাড়ে এগারোটা হলো।

ট্রেন আধঘণ্টা লেট। বালিগঞ্জে বজবজের সংগে ক্রশিং ছিল। ওটা লেট থাকায় এ ট্রেনটাকেও লেট করানো হয়েছে বালিগঞ্জে আধঘণ্টা।

শেষ পর্যন্ত বজবজ্ তবু এসে না পৌঁছনোতে আবার ছেড়েও দেওয়া হয়েছে ট্রেনটাকে। কী দরকার ছিল তবে লেট করাবার?

নিয়ম। সে নিয়ম তবে ঠিক থাকে না কেন—কেন সময়মতো গাড়ি আসে না।

এ প্রশ্ন নিরর্থক। জবাবতো সবারই জানা। রেল কর্তৃপক্ষ সংগে-সংগে বলবেন আমরা কি করবো—আপনারা, তার কাটবেন, সময়মতো ডিউটিতে আসবেন না, কিছু বলতে গেলে ধর্মঘট করবেন, ট্রেন আসবে কি করে সময় মতো ?

ঠিক! যুক্তি নেই এর উপর। যাত্রীরা নাগরিক নয়, তারাতো স্বাধীন দেশের লোক নয় - তারাতো শুধু যাত্রী।

টলতে টলতে ঘরে ফিরে আলো জ্বালালো প্রিয়তোষ। শুধু এ বাড়িটা কেন, পাড়াটা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ।

না, ওর ঘুমোবার সময় হয়নি এখনও। জামাকাপড় ছেড়ে হাতে করে এক মুঠো মুড়ি নিয়ে এক গ্লাস জল খেলো সে। দু' মুঠো নিলে সপ্তাহ কুলোবে না। ওই এক মুঠোই যথেষ্ট। শরীর শুনবে না মানে—সে কি শরীরের অধীন না ওটা তার অধীন! তবে ?

বিছানা পেতে প্রুফ দেখতে বসলো এবার প্রিয়তোষ। সকালে সময় হবে না। এখনই ক্লান্ত হয়ে পড়লে চলবে কেন ? ঠাণ্ডা স্যাঁত-স্যেঁতে মেঝেয় ড্যাম্প্ উঠে বিছানা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যাক—ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়ে অঘ্রাণের উত্তুরে হাওয়া এসে হাড়ে কাঁপন জাগায়—জাগাক।

প্রুফ্ না দেখলে আজকের আয় আর হবে না যে। গায়ের কাঁথাটাকে আরও শক্ত করে গায়ের সংগে জড়িয়ে নিলে। প্রিয়তোষ। তারপর কাজে মন দিল।

কে যেন বাইরে থেকে দুয়ারের কড়া নেড়ে বলল, ছেলে ফিরেছো নাকি ?

গলা শুনে চিনলো প্রিয়তোষ বাড়িউলিকে। বলল, কে মাসীমা ? কি বলছেন ?

অধীরবাবু এসেছিলো। বলে গেছে, যত রাত হোক একবার তাদের বাড়ি যেতে।

—কেন ?

—কি জানি। তবে বলল, কাটিহার থেকে নাকি নতুন আতপ চাল এনেছে—তাই নবান্ন হচ্ছে ওদের।

কাটিহারে অধীরের শ্বশুর বাড়ি। জোতদার তাঁরা। নতুন ধান উঠেছে বলে কিছু আতপ চাল পাঠিয়েছেন জামাইয়ের বাড়িতে এই সুদূর বাংলা মুলুকেও। সেই চালের নবান্ন এতো আনন্দের কথা।

কিন্তু এখন এই রাত-বারোটার সময় তো আর যাওয়া যায় না অধীরদের ঘুম ভাঙিয়ে সেই নবান্নের পঞ্চ ব্যঞ্জন সমন্বিত সামগ্রী খেতে।

আজকে রাতটা খাওয়া যেতো পেট ভরে—গেল না। না যাক, এতদিন বাড়িতে-তো খেয়েছে—এখন কিছুদিন আবার রাতে না খেয়ে বা সকালে আধপেটা খেয়ে কাটালে ক্ষতি কি। জীবনের স্রোত যে সব সময় একই মুখে বইবে এর কোন যুক্তি আছে ?

প্রুফ্ দেখে চললো প্রিয়তোষ। রাত বারোটা একটা দুটো বেজে গেল ক্রমে ক্রমে। তখন শেষ হ'লো কাজ। চোখে মুখে জল দিয়ে এক গ্লাস জল খেলো এবার সে। তারপর একসময় বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ক্লান্তিতে চোখ দুটি বুজে এলো সঙ্গে-সঙ্গেই।

টাইম পিসে এলার্ম দেওয়াই ছিল। ঠিক ছ'টায় ডেকে দিল সে। সময়টা যে মাপা প্রিয়তোষের।

স্টোভে চা করে খেয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে পুনরায় স্টোভে ডাল ভাতে ভাত রেঁধে খেয়ে বেরোতে হবে সব গুছিয়ে ন'টার মধ্যে। তবেই দশটায় পৌঁছনো যাবে কলেজ ষ্ট্রীটে। প্রুফ ফেরত দিতে হবে। যেদিন না থাকবে সেদিনও যেতে হবে কারণ অভ্যেস নষ্ট হয়ে যাবে না হলে।

প্রিয়তোষ বেরোলো ঠিক সময়মতো। ক্যানিং থেকে কোলকাতা দূর বলে বারোটা-সাড়ে বারোটায় আসা চললেও, এখানে অত দেরিতে এলে চলবে কেন—এই প্রুফ্ গেলে তবে তো প্রেস কাজ করবে।

সপ্তাহটা কেটে গেল দেখতে দেখতে।

শনিবার টাকা পেল প্রিয়তোষ। যদুবাবুর কাছ থেকেই পেল কুড়ি টাকার মতো। আরও তিন জায়গা মিলিয়ে আরও দশ বারো টাকা পেল।

হ্যাঁ, অধীরের টাকাটা ও শোধ করলো সে প্রথমে। বাকি টাকা দিয়ে এক সপ্তাহ চলবার মতো চাল, ডাল, আলু, চা-চিনি-কেরোসীন ইত্যাদি সব কিছুই কিনলো কিছু-কিছু। হাতে চারপাঁচ টাকা রইলোও।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লো সে। এ ভাবে বরাবর কাজ জুটলে চলে যাবে যাহোক করে। বাজার মন্দা—বইয়ের বেচাকেনা নেই। না'হলে প্রুফ্ দেখেও চলতে পারে একটি পরিবার। সে তো একা—ভাবনা কি।

পুরো সপ্তাহ কাজ করেছে প্রিয়তোষ আর ভবিষ্যতের সুন্দর স্বপ্ন দেখেছে।

ব্যবসা চললে কিছু জমাবে সে। তারপর একটি বিয়ে করবে, বাড়ি করবে। শেষ জীবনের জন্য সঞ্চয়ও করবে কিছু-কিছু।

না, লেখার কথাও ভোলেনি সে। সময় পেলে লেখাপড়াও করবে। একদিন না একদিন ওর থেকেও কিছু কিছু আয় হবে। আসলে ধৈর্য চাই—ধৈর্য আসল। এই বস্তুটি যাদের মধ্যে নেই তারাই জীবনে ব্যর্থ। সে কেন হবে তা'?

আজ রবিবার। একটু দেরি করেই উঠবে ভেবেছিলো প্রিয়তোষ। কিন্তু পারলো না।

ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া না থাকলেও, অন্যদিনের চেয়ে একটু আগেই উঠে পড়লো। চা খেলো। তারপর বেরোলো ক্যানিং এর উদ্দেশ্যে।

জিনিস-পত্র আনতে হবে কিছু কিছু করে। হাঁড়ি-কুড়ি, শিশি-বোতল-কৌটো, বাক্স-বিছানা ইত্যাদি অনেক কিছুই দরকার সংসার করতে গেলে।

ন'টা নাগাদ বাড়ি পৌঁছলো সে। মা'কে বলাই ছিল আজ আসবার কথা। তিনি পথ চেয়ে ছিলেন। সে পৌঁছতেই তিনি বললেন, আয়—আমি ভাবছিলাম আবার না আসিস্ নাকি?

—কেন?

—তোর খেয়াল তো!

কিছু মূলো কিনে এনেছিল প্রিয়তোষ। শীতের দিন। তা'ছাড়া এ জিনিসটা তার ও তার মা'র উভয়েরই প্রিয়। মা ওকে মূলো আনতে দেখে বললেন, এ গুলো আবার আনলি কেন?

—আনলাম ইচ্ছে হ'লো।

—কিছু কম করে আনলে পারতি। পয়সা হাতে পেলে আর

কথা নেই—খরচ করে ফেলবি। সংসার পেতেছিস, এবার বুঝবি পয়সা হাতে না থাকলে কি অসুবিধে।

প্রিয়তোষ কিছু বলল না প্রত্যুত্তরে। মা তরকারী কুটে রাখছেন ভাগে ভাগে। বেশ বোঝা যাচ্ছে মনের সাধে ছেলেকে খাওয়াবেন আজ নানা রকম রান্না করে। কিন্তু কেন, যে ছেলে আপনার হ'লো না কোনদিন, তার জন্যে এত মায়া কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চাইলো বুক ফেটে। তাকে চেপে রাখলো প্রিয়তোষ। এমন যে মা তাঁর কাছে থাকতে পেল না সে—পেল না তাঁকে নিয়ে ঘর করতে।

পড়াশোনা ছাড়ার সংগে-সংগেই বাবার মৃত্যু হলো। দু'ভাই ওরা নামলো রোজগার করতে। দেবতোষ একটি চাকরিতেই স্থায়ী হ'লো। সে হ'লো না পনেরোটায়ও।

কতবার রাগ করে, অভিমান করে বাড়ি ছাড়লো আবার এলো—আবারও বেরোতে হলো শেষ পর্যন্ত। কী পেয়েছে সে লিখতে গিয়ে—কিছু না।

তবু ওই মরিচীকার পেছনেই ছুটতে হচ্ছে তাকে আজও। সে জানে না কী তার পরিণতি। তবু এই ছোটাই বুঝি ওর বিধিলিপি, ওর ভাগ্য—উপায় নেই এই অমোঘ বিধানকে না মেনে নিয়ে।

জলখাবার প্রস্তুত করেই রেখেছিল অতসী। একটু পরেই সে একটি থালায় কিছু বেগুন ভাজা ও অনেকগুলো লুচি সহ এক কাপ চা এনে রাখলো সামনে।

লুচিগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রিয়তোষের মনে পড়লো নিজের বর্তমান দুর্দশার কথা। এই এক সপ্তাহ এদের মুখ দেখা দূরের কথা প্রয়োজন মতো সামান্য খাবারের সংস্থানও হয়নি তার—হয়তো শীগগির হবেও না আর। তাই থালাটি হাত তুলে নিয়েই বলল, এত পারবো তো খেতে?

—খুব পারবেন। ওই কটা দিয়েছি—তা'ছাড়া খেতে বেলা হবে।

মা বললেন, খা'—গরম লুচি তুই তো ভাল বাসিস্।

—হ্যাঁ, ভালবাসি বলে না পারলেও খেতে হবে!

মা প্রসঙ্গ এড়িয়ে অতসীকে বললেন, বৌমা, পায়েস রাখোনি ওর জন্যে?

—যাঃ, ভুলে গিয়েছিলাম তো। অতসী ছুটলো ঘরে পায়েস আনতে।

মা বললেন, কাল রাতে ভেবেছিলাম আজ শনিবার তুই আসবি রাতে। তাই পায়েস করেছিলাম। কাল এলি না—এখন বাসি খা!

—এর উপর আবার পায়েস? না, তোমরা দেখছি আমাকে আর এ বাড়ি আসতে দেবে না।

—কেন?

এত খেতে পারে মানুষে! আমি কথা শুনি কিনা তাই বেশি বেশি করে দেবে আমাকে। কই, খাওয়াও তো তোমার দেবুকে? সে খেতো তোমার এতগুলো লুচি—দু'খানা খেয়ে বলতো, আর পারছি না।

মা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন একটা। অতসী পায়েসের বাটি নিয়ে এলো।

এদিকে দেবুও বাজার করে হাজির হলো এ সময়। এখুনি বেরোতে হবে আবার তাকে। দাঁড়াবার সময় নেই। তবু থলেটা রান্না ঘরের দরজায় রেখে হাত ধু'তে ধু'তে বলল সে দাদাকে উদ্দেশ্য করে, কখন এলি?

—এই তো—একটু আগে।

দেবতোষ বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে অতসীকে উদ্দেশ্য করে বলে গেল, মাংসটায় ঝাল দিও একটু বেশি করে—দাদা তো ঝাল্ ভালবাসে।

পারবো না—পারবো না করেও সব খেলো প্রিয়তোষ। প্রচুর ভোজনের দরুণ শরীরটা অস্বস্তিকর মনে হতে লাগলো। না, বসা যাচ্ছে না আর এই অবস্থায়।

একটার আগে বেরোবার দরকার নেই। দেড়টার গাড়িতে যাবে

সে সোনারপুর। মায়ের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো তাই একটু। ওখান থেকেই জিজ্ঞেস করলো একসময়, আমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রেখেছো মা ?

—হ্যাঁ। দেখ্ আর কি-কি বাকি রইলো।

—দেখতে হবে না। সব নেবো না এবার—ঘর ছোট। যে গুলো না হলে নয় সে গুলো দিও, বাকিগুলো তোমরা রেখে দিও—আমার আর লাগবে না।

—লাগবে না কেন—সেই তো আবার কিনবি। বেশ, আমার কি ; কিনবি আর বিলোবি—পয়সা তো বেশি হয়েছে !

একটার পরে বেরোলো প্রিয়তোষ। দু'হাতে দুটো বোঝা। রিক্সা করবে না ভেবেছিলে। মাঝ পথ পর্যন্ত গিয়ে তা' না করে পারলো না। টুকি-টাকি জিনিসপত্র কম নয়। যতটা পেরেছে নিয়েছে—বাকিগুলো নিতে সাড়ে চারটের ট্রেনে আবার আসতে হবে। মান্থলি আছে আরও এক সপ্তাহ। রবিবার ছাড়া সময় নেই। অতএব আজ আর এক ট্রিপ মারতে হবে।

আড়াইটে নাগাদ ঘরে পৌঁছলো প্রিয়তোষ। জিনিস-পত্রগুলো ঘরে রেখে অধীরের বাড়ি এলো।

এক ঘণ্টা বাকি এখন ক্যানিং ট্রেনের। সময়টা কাটানো যাবে ওখানে। অনুরোধের আসর চলছে রেডিওতে। অধীর শুয়ে শুয়ে গান শুনছিল।

বলল, এস !

প্রিয়তোষ ঘরে ঢুকে শু'ল গিয়ে ওর পাশে।

অধীর বলল, সকালে দেখলাম না যে—কোথায় গিয়েছিলে ?

—ক্যানিং।

—কেন ?

—মাল-পত্র নিয়ে এলাম কিছু।

—হ্যাঁ, আনো। ঘরটা গুছিয়ে নাও আগে—তারপর বিয়ে-থা করো একটা।

—বিয়ে ?

—হ্যাঁ, বয়েস তো আর কম হলো না। এরপর না হলে আপশোষ করতে হবে বলে দিচ্ছি। মোটকথা পাঁচ বছর সময় দিচ্ছি তোমাকে—এর মধ্যেই যা হোক করে ফেলতে হবে।

—পাঁচ বছব তো ঢেব সময়। এর মধ্যে বিয়ে কেন—বাড়িও করে ফেলবো একটা।

অধীরেব স্ত্রী জয়ন্তী পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে অনুরোধের আসর শুনছিল। ওদেব আলোচনার মাঝে বলে উঠল, আমাদের সোনারপুরে কিন্তু যে-ই আসে সে-ই বাড়ি করে ফেলে।

—তাহ'লে আমারও হবে কি বলুন ?

—হবে না তো কি—নিশ্চয়ই হবে। জয়ন্তী বলল ওঘর থেকেই।

অধীর অন্য প্রসঙ্গে গেল, তারপর, লেখা-টেখা হচ্ছে কিছু ?

—লেখা ? এখন কি আমার লেখার সময় ?

—কেন সময় নয় ?

—মানসিক অবসর কই আমার ?

—ও সব দোহাই রাখো। কী করেছো এতদিন ? এতখানি বয়েস তো হ'লো—বলো, একটাও সার্থক কিছু করতে পেরেছো ? এমন একটা কিছু লিখেছো আজ পর্যন্ত যা তোমাকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রাখবে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো প্রিয়তোষের বুকটা চিরে, সে রকম আর পারলাম কই—মানে জীবনে আমার সময় এলো কই ?

—দেখো, ওসব বাজে দোহাই দিও না। যার হয় তার ওর মধ্যেই হয়।

প্রিয়তোষের সেন্টিমেন্টে লাগলো। শিল্পীরা একটু বেশি ভাবপ্রবণই হয়। একবার সেখানে ঘা লাগলে উপায় নেই। সপ্তমে বাঁধা সেতারের মতো বিরাট চীৎকার করে উঠবে।

সে'ও চীৎকার করে উঠলো, এ আর তোমার ছড়া লেখা নয় যে পথ চলতে-চলতে দু'লাইন কি চার লাইন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লিখে নিলাম। দস্তুর মতো ভাবতে হয় এ জন্যে, বসতে হয় ভাবতে হয়, লিখতে হয় পরিশ্রম করে পাতার পর পাতা। তবেই জন্ম নেয় একটা গল্প বা উপন্যাস বা প্রবন্ধ।

—আমাদের বুঝি ভাবতে হয় না! ছড়া লেখা এতই সহজ—কই, লেখতো তুমি দেখি!

অধীরের মা এসে থামিয়ে দিলেন ওদের ঝগড়া শেষ পর্যন্ত। অবশ্য ছেলের পক্ষই সমর্থন করলেন তিনি।

বললেন, মিথ্যে ঝগড়া করছো তোমরা প্রিয়তোষ! ছড়াই বলো আর গল্পই বলো কোনটাই সহজ নয় তবে ছড়াটাই কঠিন বেশি। কারণ, ছোটদের মনের খবর রাখতে হয় এ:তে ছোট বয়েস পার হয়ে এসেও।

সময় হয়ে গিয়েছিল ট্রেনের। প্রিয়তোষ উঠলো। জয়ন্তী বলল, বসুন—চা খেয়ে যান্!

—সময় নেই! প্রিয়তোষ ছুটলো।

সাড়ে চারটেয় আবার ক্যানিং-এ নামলো। বাড়ী পৌঁছলো পাঁচটার আগেই।

একটি বড় বস্তার মধ্যে কৌটো—বোতল ইত্যাদি ভর্তি করে রেখেছিলেন মা। পাড়ার একটি মজুরকে বলে রেখেছেন বোঝাটা ষ্টেশন পর্যন্ত দিয়ে আসবার জন্য। সন্ধ্যের পর কাজ সেরে সে আসবে। ওর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো প্রিয়তাষ।

অতসী চা বসিয়েছিল। এখন তা' এনে দিলো। মা পাশে বসে বোঝাচ্ছিলেন ওকে ভবিষ্যতের বিষয়ে। হঠাৎ প্রিয়তোষের এক বন্ধু সপরিবারে এসে হাজির হলো জয়নগর থেকে।

এক সময় এ বাড়িতে খুব যাতায়াত ছিল সুভাষ ও মহুয়ার।

আজকাল কম আসে। এখন ওরা ঘোর সংসারী—চারটি ছেলে-মেয়ের মাতা-পিতা।

সুভাষ বলল, তুই তো যাস্‌না আর, তাই আমরাই এলাম।

—আর যাবো কি—মানে, নানা ঝামেলায় কেটে যাচ্ছে আমার দিন গুলো।

মহুয়া বলল, হ্যাঁ ঝামেলা না ছাই—আসলে বিরাট লেখক হয়ে গেছেন এখন আপনি, আমাদের মতো সাধারণ লোকদের ওখানে যাবার সময় হবে কেন?

—না, তা' নয়। মানে—

ওকে বাধা দিয়ে সুভাষ বলল, হ্যাঁ তাই ঠিক!

—না ঠিক নয়। মানে আমার কিছু ঠিক আছে নাকি। ঠিক সময়েই এসেছিস্—একটু পরে এলেই আমার সংগে আর দেখা হতো না।

—কেন?

—আমি চলে গেছি এখান থেকে। বাসা নিয়েছি একটা সোনারপুরে।

—সেকি!

—হ্যাঁ।

সুভাষ ওদের বাড়ি জয়নগরে। সোনাবপুরেব উপর দিয়েই ওদের যাতায়াতের পথ। মহুয়া এখন সুভাষকে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে বলল, ঠিকানাটা নিয়ে নাও না—তুমি প্রায়ই যাও কোলকাতায়, একদিন দেখে আসবে বাসাটা।

—কেন, এবারও কিছু খবর আছে নাকি?

—হ্যাঁ সেই জন্যেই তো এলাম। না হলে এই সন্ধ্যের সময় কেউ আসে। বারুইপুরে এসেছিলাম মাসিমার বাড়ি। ভাবলাম যাই একবার ক্যানিং থেকে ঘুরে আসি—প্রিয়টার একটা সদ্গতি করে আসি। তা' এবার অমত করলে শুনবো না। শাশুড়িকে এক রকম

কথাই দিয়ে এসেছি আমি। যেমন করেই হোক মত করাবো আমি প্রিয়কে।

—আাম দুঃখিত বন্ধু! তোমার কথা দেওয়া রক্ষা করা সম্ভব হ'লো না আমার দ্বারা।

মহুয়া বলল, কেন, অমিয়াকে কি আপনার পছন্দ হয় না! তা' আমার বোনকে যদি পছন্দ না হয় আর একটি মেয়েও আছে আমাদের হাতে।

মা গিয়েছিলেন ওদের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে। আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় এ সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বললেন, না, তোমরা আর চেষ্টা করো না মা—ও হতভাগাটার জন্য কেউ কিছু করো না তোমরা। ও চিরকাল হাত পুড়িয়ে খাবে। ওর বউ তৈরি করেন নি ভগবান।

নির্দিষ্ট মজুরটি এসে গেল এ সময়। প্রিয়তোষ উঠল। মা'কে প্রণাম করলো। তারপর বোঝাটি মজুরটির মাথায় তুলে দিয়ে সুভাষকে বলল, চলি, আমার গাড়ির সময় হয়ে গেছে—তা' তোরা থাকবি তো আজ?

—থাকবো কিরে, বড় মেয়েটা একলা রয়েছে বাড়ি—ওকে বাড়ি পাহারা দেবার জন্য রেখে এসেছি। তা' একটু দাঁড়ানা—পরের ট্রেনে আমরাও তো যাবো!

—না রে। আমার আবার একটু কাজ আছে ওখানে।

—তা' তোর ঠিকানাটা দিয়ে যা।

ইচ্ছে করেই ঠিকানা দিল না প্রিয়তোষ।

বলল মিথ্যে করে, নতুন গিয়েছি—ঠিকানাটা জানি না এখনও। ষ্টেশনে নেমে সোজা চলে যাবি রাজপুরের দিকে। রাস্তার ধারে হেরু মণ্ডলের বাড়ি।

ঘরে ফিরে গোছ-গাছ করে উঠতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিলো। হাত মুখ ধুয়ে আসতেই ক্ষিদেও পেল। আজ খাবার চিন্তা নেই। আসবার সময় মা পকেটে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে দিয়েছিলেন।

সেটা খুলে রুটি তরকারী খেলো প্রিয়তোষ। তারপর শুয়ে পড়লো। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না। কি যেন এক অব্যক্ত বেদনা গুমরে-গুমরে উঠতে লাগলো ওর কণ্ঠের কাছে।

তবু ঘুমিয়ে পড়লো এক সময় ওর মধ্যে।

ঘড়িতে এলার্ম দেওয়াই ছিল। ছ'টায় ঘুম ভাঙিয়ে দিলো সে। যথারীতি চা খেয়ে ষ্টোভে ভাতে-ভাত বসালো প্রিয়তোষ। কাল সকালে বাড়িতে সে যে মূলো নিয়ে গিয়েছিলো তার থেকে ছু'টি মা গোপনে দিয়ে দিয়েছিলেন মাল-পত্রের মধ্যে। তাই ভাতে দিল আর এক টুকরো ন্যাকড়ায় কিছু মুসুরি ডাল।

এরপর একটু অবসর মিললো। স্নানে যেতে এখনও পঁচিশ মিনিটের মতো বাকি।

সময়টা শুয়ে কাটালে লাভ কী! পুরোনো ম্যাগাজিন একটা নিয়ে পড়তে বসলো। ইদানীং ম্যাগাজিন আর কেনা হচ্ছে না পয়সার অভাবে।

ওর ঘরটা মাঝামাঝি। লাইনের তিনটি ঘরের মধ্যে একপাশের একটি অন্য এক ভাড়াটের। ভদ্রলোকও একা থাকেন। অবশ্য তিনি বিবাহিত। তার ফ্যামিলি দেশে থাকে। এখানকার সেটেল্‌মেন্ট অফিসের কর্মী।

আলাপ হয়েছে প্রিয়তোষের সংগে ভদ্রলোকের। তার হাবভাবে বোঝা গেছে তার পদটি পিওন অথবা বেয়ারা গোছের। নাম অনুকুল। সে এখনও রাঁধছে।

প্রিয়তোষের পরেই বেরোয় সে। ওর রান্নার জন্য কড়া খুন্তির ঠুং-ঠাং শব্দের সংগে সস্তা হিন্দী বাংলা ফিল্মের গানের ছু'একটি লাইনও মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে। অন্য পাশের ঘরটি বাড়িওয়ালার বড় ছেলে মহিম চন্দ্রের।

মহিম এখন ঘরে নেই। ক্ষেতের কাজে গেছে। ধান কাটা হচ্ছে ওদের। অগ্রহায়নের প্রথম এখন।

ওর বউ সুবাসী সকাল বেলার কাজ সেরে রান্না বসাতে যাবার অবসরে স্বামীর থেকে দু'তিন বছরের ছোট পরবর্তী ননদের সংগে গল্প করছে। ওদের আলোচ্য বিষয় সিনেমা। সীতা কাল রাতে সিনেমায় গিয়েছিলে। সেই গল্প বলছে এখন সে বৌদির কাছে।

দু'পাশের দু'ঘরের গণ্ডগোলে পড়ায় মন বসলো না প্রিয়তোষের। মিনিট কয়েক তবু ম্যাগাজিনটা উলটে-পালটে গেল সে। ওর ছোট্ট ঘরটির দরজায় ঝোলানো রঙীন পরদাটি বড় মনের পরিচয় বহন করে অবস্থান করছে প্রথম দিন থেকেই।

বাতাসে এখন তা' দুলছিলো বলেই তার ফাঁক দিয়ে বাইরে নজর পড়লো এবার প্রিয়তোষের।

দরজার সামনের হাত দুই চওড়া সরু বারান্দার পরেই অনেক বড়ো একটি উঠান। তারপর একটি ছোট-খাটো বাগানের পরে একটি এঁদো ডোবার শেষে নিবিড় বেনুবন।

সেইদিকে নজর পড়লো হঠাৎ। পড়া বাদ দিয়ে পরদার দুলুনির ফাঁকে ফাঁকে সেই বেনুবনের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে প্রিয়তোষ ভাবছিলো সুখের কথা। পয়সা-কড়ি একটু বেশি আয় করতে পারলেই ভালো পরিবেশে একটি ভালো ঘর নেবে সে।

হঠাৎ বাড়িউলি পরদার আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে বাইরে থেকেই বলে উঠলো, ছেলে, র্ঁাধ্‌লে না?

—হয়ে গেছে।

—কখন র্ঁাধ্‌লে, কী র্ঁাধ্‌লে?

—কী আর র্ঁাধ্‌বো, ষ্টোভে ভাতে ভাত ছাড়া কিছু রান্না করা যায় না ভালো করে। বারান্দায় রান্নার জায়গাটা আপনারা ঘিরে দিচ্ছেন না যে উনুন কিনে ভালো করে রান্নার ব্যবস্থা করবো—

—হ্যাঁ, দেবো বাবা রান্নার জায়গা ঘিরে।

বাড়িউলি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো এবার। একটু আস্তে বলল আবার, তোমার মেশোমশাইকে বলো না বাবা—বড় কিরপিন্ লোক! আমি বলে বলে হাল্লাক্—একটা পয়সা গলবে নি হাত থেকে।

সুযোগ বুঝে বাইরে এলো প্রিয়তোষ। বাড়িওয়ালা বাঁ দিকের সারিতে অবস্থিত নিজের ঘর দু'টির লম্বা টানা বারান্দাটির মাঝখানটিতে বসে পান্তা খাচ্ছিল।

ওর সামনেই উঠোনের ও ধারে—আর এক শ্রেণী ঘর। তার মধ্যে বাগানের দিকের দুটি মানুষ থাকার। তার পরেরটি গোলা এবং সর্ব শেষেরটি গোয়াল। সবগুলিই পাকা।

সাদা রং করা। গোয়াল ঘর আর মহিম চন্দরের ঘর এর মাঝ দিয়ে এ বাড়ি থেকে বেরোবার রাস্তা। না গেট নেই—খোলা।

সামনেই বাঁ দিকে পূর্বোল্লিখিত মদের দোকান কাম মদ ব্যাপারীর বাড়ি। ডাইনে স্যাকরার দোকান কাম পাড়ার নিচুক্লাশের কোচিং রুম বাড়ি। মাঝ্ দিয়ে হাত পঁচিশ-তিরিশ কাঁচা রাস্তার পর ডাইনে বাঁয়ে লম্বা সরু পিচ্‌বাঁধানো সদর রাস্তা। বাঁ দিক ষ্টেশনে ও ডানদিক গ্রামের ভিতরে চলে গেছে।

বাড়িওয়ালা সামনের উঠোনের পরের গোলাঘরের দিকে চেয়ে পান্তা খাচ্ছিল কিছু ভাবতে ভাবতে। অন্যদিন কর্তা গিন্নী দু'জনেই এক সংগেই মাঠে থাকে এ সময়। আজ বোধ হয় তেমন কাজ নেই। দু'জনেই বাড়ি আছে তাই।

বাড়িউলির নির্দেশ মতো প্রিয়তোষ বাড়িওয়ালাকে বলল, মেশোমশাই, আমার রান্না ঘরটা করে দিচ্ছেন কবে?

বাড়িউলি পাশেই ছিল। বলল, একটু জোরে বলো বাবা, মিন্‌সে কানে কম শোনে একটু!

একটু জোরে কথাটি আবার উচ্চারণ করলো প্রিয়তোষ। বাড়িওয়ালার তবু এদিকে দৃষ্টি না পড়াতে বিষয়টি তার কর্ণগোচর হয়নি বোঝা গেল।

তখন বাড়িউলি সাহায্য করলো ওকে। অনুকূলের দরজার

সামনে পা ছাড়িয়ে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, কাঁড়ি কাঁড়ি পান্তা গেলা হচ্ছে খালি, ভাবনা নেই চিন্তা নেই আমার ভোলা মহাদেবের—বলি, বাড়িতে ভাড়াটে রেখেছো তার আন্নার জায়গা করে দিতি হবে না! ভাড়া খাচ্ছো কোন মুখে, নজ্জা করে না—ঝাঁটা মারি অমন মুখে, তোর মুখে আগুন!

যে দেবতার যে স্তব।

এবার বাড়িওয়ালা এদিকে তাকালো।

প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, দেবোতো বলেছি—নেহাত ধান-চালগুলো মাঠে পড়ে রয়েছে তাই; ওগুলো সামলে না নিলে কবে চোর-ছ্যাচরে নিয়ে যাবে!

বাড়িউলি সমান সুরে বলল, নিকুগে—তা'বলি, ভদ্দরনোকের ছেলে রোজ ভাতে ভাত খেয়ি কাটাবে? কেন জবানের দাম নি'—তা, ভাড়া দেছেলে কেন? তোর বাড়ি এ সব ভাড়াটে থাকবে কেন, থাকবে যত মদো মাতাল এই সব—ওই ঝমন্ রয়েছে।

বাড়িওয়ালা এবারেও নির্বিকার। তার বড় জাম্‌বাটির পান্তা তখনও ফুয়োয়নি।

অনুকুলের ঘরের পরে ওধারের শ্রেণীর ঠিক কোণটিতে একটু দূরে যে নিচু মতো একটি ঘর ছিল এতদিন সেদিকে নজর পড়েনি। "ওই ঝমন্ রয়েছে" কথাটিতে ওদিকে নজর পড়তেই মনে হলো হ্যাঁ, ওদিক থেকে রোজ সকালে নোংরা পোষাক পরিহিতা ভিখিরি ক্লাশের একটি মেয়ে বেরোয় বটে। প্রিয়তোষ ওর নাম উচ্চারণ করতে শুনেছে বাড়িউলির কণ্ঠে—সোহাগী। সে যে ওদিকের ওই ঘরটায় থাকে জানতো না।

একবার ওদিকে তাকালো এখন। না, সে নেই। ঝি গিরি করতে বেরিয়েছে। দুপুরের দিকে ফিরবে। তারপর উঠোনের মাঝখানে তোলা উনুনে আঁচ, ধরাবে রান্নার জন্যে। বাড়িউলি ওর সংগে তুলনা করে প্রিয়তোষের উপর উচুঁ মনোভাব পোষণ করায় সে

এখন গর্ব অনুভব করলেও সংগে সংগে দুঃখিতও হলো পরিবেশের কথা স্মরণ করে।

যাই হোক, স্নানের সময় হয়ে গিয়েছিলো। বরং পাঁচ মিনিট বেশি অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল ঘড়ির কাঁটায়। না, দেরি করলে নির্দিষ্ট ট্রেণ্ পাওয়া যাবে না। এখন সে স্নানে গেল।

পরের রবিবার বাড়ি গেল আবার প্রিয়তোষ। মান্থলির আজ শেষ দিন। শেষ-মেষ যা আনা যায়।

হ্যাঁ, রান্নার জায়গা ঘেরা হয়েছে তার। হোগ্‌লা দিয়ে ঘিরেছে বাড়িওয়ালা দু'দিক। এক দিকে ঘরের দেয়াল। ও দেয়ালের জানলাটি ঢাকা পড়ে গেলেও বারান্দায় ঘর হয়েছে একটি আজ।

সামনে হাত দু'য়েক উঁচু একটি আগড় দড়ি দিয়ে বেঁধে দরজাও বানানো হয়েছে। ওই দরজায় ছোট একটি লোহার শিকল দিয়ে তালা ঝুলিয়েছে প্রিয়তোষ।

রান্নাঘর ও ঘর সাজিয়েছে প্রিয়তোষ এক দিনের মধ্যে।

কয়লা, ঘুঁটে, জলের বালতি, উনুন হাঁড়ি কড়া ইত্যাদি রান্নার আসবাব সেখানেই রেখেছে। বাক্স, বিছানা, স্টোভ্‌ চায়ের সরঞ্জাম, কাপড়-গামছা, শিশি-বোতল-কৌটো ইত্যাদি শোবার ঘরের যথাস্থানে রক্ষিত হয়েছে। তবু যেন শেষ নেই এ সাজানোর।

ভোরবেলা উঠেই চা খেয়ে তাই বেরোলো প্রিয়তোষ ক্যানিং এর উদ্দেশ্যে। ষ্টেশনে এসে সংগে-সংগে গাড়িও পাওয়া গেল একটা। অতএব, আটটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছানোও গেল।

মা যথারীতি সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে তরকারীর ঝুড়ি ও বঁটি নিয়ে বসেছেন আঙিনায়।

প্রিয়তোষ পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি উঠে গিয়ে আসন এনে পেতে বললেন, বোস, আমি ভাবছিলাম আবার আসবি না নাকি!

এ সব কথার জবাব দেবার দরকার নেই। চুপ-চাপ বসে তাই

সামনের প্রাঙ্গনের দিকে চেয়ে রইলো সে। মা এবার অতসীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বৌমা, তোমার ভাসুর এসেছে।

প্রিয়তোষ বুঝলো মা অতসীকে চায়ের তাগিদা দিলেন।

অতসী রান্নাঘর থেকেই জবাব দিলো, দেখেছি—এই চায়ের জল বসাচ্ছি।

—কিছু খেতে দাও আগে, এত সকালে যখন এসেছে খেয়ে আসেনি নিশ্চয় কিছু—ও' আবার খিদে সহ্য করতে পারে না।

—দিচ্ছি।

অতসী পাশের খাবার ঘরে ঢুকলো। মা জিজ্ঞেস করলেন, খেয়ে এসেছিস কিছু?

—চা খেয়েছি।

—রাতে কী খাস্?

—খাই যাহোক কিছু!

—খাস্‌তো, নাকি না খেয়ে শুয়ে থাকিস্?

—না খেয়ে শুয়ে থাকলে যদি চলতো, তা'হলে আর ভাবনা ছিল কি মানুষের?

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর গলাটা একটু খাটো করে আরার বললেন, হ্যাঁরে, পয়সা-টয়সা পাচ্ছিস কিছু আজকাল? কলেজ স্ট্রীটে কাজ-টাজ হচ্ছে কিছু এখন?

—হচ্ছে কিছু কিছু।

—আমার কাছে কয়েকটা টাকা আছে। অনুরাধা দিয়ে গেছে হাত খরচের জন্য! আমার আর কিসে লাগবে—নিবি?

—না। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করলো প্রিয়তোষ। এত স্নেহময়ী তার মা।

অতসী এ সময়ে প্রাতঃরাশের আয়োজন করে আনলো। কিছু চিঁড়ে ভাজা, আলু ভাজা আর ফল ও মিষ্টি।

—এত খাবো কি করে? চিঁড়ে ভাজার প্লেট্‌টি হাতে তুলে নিয়ে প্রিয়তোষ বলল।

মা বললেন, নে, আর ন্যাকামি করিস্‌নে—ওই ক'টা তুই খুব খেতে পারবি আমি জানি।

অগত্যা শুরু করতে হ'লো। যথাসময়ে অতসী চা'ও দিয়ে গেল। মা জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে খাস্‌ কি সকালে?

—খাই যাহোক কিছু। আর খাবো কখন—সকালে উঠেই তো রান্না বসাতে হয়।

—খা যা তোর খুসি! জনম ভোর হাত পুড়িয়ে খাবার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিস, আমি তার কি করবো!

অতসী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, এখানে ছিলেন, সবাই এক সংগে ছিলাম চলে গেলেন কেন?

—কি করবো, তোমরা আমাকে লিখতে দিলে না। জানো তো লেখা ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না।

—তা' এখানে বসে লিখতেন?

—তা'ই তো চেয়েছিলাম। তা' আর হোলো কই? তোমরা আমায় সে সুযোগই বা দিলে কোথায়?

মা জবাব দিলেন এ কথার। একটু ঝাঁঝালোই শোনোলো তাঁর কণ্ঠে, সুযোগ দেবে কি, তুই সারা জীবন বসে-বসে খাবি আর তোর খোরাক জোটাবে কে? বেশ তো, চাকরি বাকরি করে বিয়ে কর একটা- ঘর সংসার করে বসে বসে লেখ। তা না, আজ একটা চাকরি ধরবি, কাল ছাড়বি; হাঁড়িতে কালি পড়বে না তোর কোথাও—তোর সংগে সবাই একসঙ্গে থাকবে কি করে?

—ঠিক। তাই তো দূরে সরে গেলাম আমি।

—যা! তুই সুখে থাক, এর বেশি তোর কাছে আর কিছু চাই না আমি। যাবার আগে যদি দেখে যেতে পারি তোর পেছনে কেউ আছে তোকে দেখবার মতো তা'হলেই সুখে মরতে পারি—পারলে এইটুকু শান্তি দিস্‌ আমাকে।

প্রিয়তোষ আর বসলো না সেখানে। মায়ের ঘরে এসে শুয়ে

পড়লো। সময় কাটাতে শুয়ে থাকার চেয়ে ভাল উপায় আর কিছু নেই ওর কাছে।

কিন্তু আজ শুয়ে শুয়ে ভালো লাগল না প্রথম প্রথম। তাই উঠে দেবতোষের ঘরে গিয়ে রেড়িও খুলে দিয়ে এলো এবার। তারপর যথাস্থানে এসে আবার শুয়ে শুয়ে গান শুনতে শুনতে সময় কাটাতে লাগলো। এক সময় কখন ঘুমিয়ে পড়লো সে ওর মধ্যে।

রেডিওটি মা এসে কখন বন্ধ করে দিয়ে গেলেন সে জানতেও পারলো না। এ বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে সে। এখানে তার ভাবনা নেই কিছু, চিন্তা নেই—এমন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, নিরবিচ্ছিন্ন অবসর যাপনের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কোথাও নেই তার। এখানে তার মা আছেন—এখানে তার অভাব কি; এখানে যে সে সম্পূর্ণ মুক্ত সাংসারিক সমস্ত ধূলিজাল থেকে।

বেলা বারোটা নাগাদ মা এসে ডেকে তুললেন, খোকা, এই খোকা, ওঠ—

প্রিয়তোষ উঠলো। যেন কোন স্বপ্নের দেশ থেকে ফিরে এলো সে এইমাত্র।

মা বললেন, যা, চান করতে যা—রান্না অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

স্নানে গেল প্রিয়তোষ।

পুকুরে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সাবান ঘষে স্নান করলো সে। অতসী আসন পেতে জলের গ্লাশ পাশে ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিল। দেবতোষ এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে।

প্রিয়তোষ আসতেই ভাতের থালা সামনে বাড়িয়ে দিলো। সে খেতে শুরু করলো। পাতের ধারে-ধারে দু'তিন রকম ভাজা-ভুজি ছাড়াও গোটাতিনেক বাটি পাশে সাজানো। এগুলি সব নিরামিশ। মায়ের হেঁসেল থেকে এসেছে। অতসীর হেঁসেলে আরও কি আছে কে জানে?

বলল, আর কিছু নেই তো ?

—একটু মাছ আছে। অতসী জবাব দিল ধীরে।

মা এসে ছেলের পাশে একটু দূরে বসলেন একটি উঁচু পিঁড়ি পেতে খাওয়ার তদারকি করতে। বললেন, ধীরে ধীরে খা'—সবইতো অল্প-অল্প দিয়েছে। বৌমা, মাছ দাও!

—হ্যাঁ।

অতসী উঠে রান্নাঘর থেকে মাছ আনলো। একটি থালার উপরে তিনটি বাটি দেখে আঁৎকে উঠলো উঠলো প্রিয়তোষ।

—সর্বনাশ, এতো খাবো কি করে ?

—নে আর পাকামি করিস না, খা' আস্তে-আস্তে।

—তুমি তো বলেই খালাস। বলি আমি কি রাক্ষস নাকি—না আমার পেটের মধ্যে বস্তা আছে যে ভর্তি করলেই হলো!

—খুব খেতে পারবি। বৌমা, মাছের বাটিগুলো রেখে ভাত নিয়ে এসো তো!

অতসী বাটিগুলো পাতের পাশে সাজিয়ে দিয়ে ভাত আনতে গেল। প্রিয়তোষ বলল, না, আর ভাত দিও না—তা'হলে এগুলো সব পড়ে থাকবে কিন্তু!

—আচ্ছা, আচ্ছা আর দেবে না, এগুলো সব খাবি তো ?

—দেখি চেষ্টা করে।

প্রিয়তোষ খাচ্ছে। মা পাশে বসে আছেন পাহারাদারের মত। খাওয়া শেষ না করে পালানোও যাবে না, লুকিয়ে কিছু ফেলে দেওয়াও যাবে না—এই জন্যই মায়ের বসে থাকা। অতএব, চেষ্টা করে খাওয়াই ভালো।

মা জিজ্ঞেস করলেন এক সময়, হ্যাঁরে, রান্না কেমন হয়েছে ?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রিয়তোষ বলল, না, তোমরা দেখছি খেয়েই ফতুর হয়ে যাবে—আজকাল খায় এত কেউ ?

—নে চুপ কর, ওসব অলুক্ষণে কথা বলতে নেই—না খেলে শরীর টিকবে কেন, খাটবি কিসের জোরে ?

—ঠিক।

ভোজন পর্ব সমাধার পর প্রিয়তোষ দেখলো চলা ফেরাই দায় ভুঁড়ির ভারে। তবু শুতে পারলো না সে। পান চর্বন করতে-করতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে গোছাবার আয়োজনে লাগলো। দেড়টার ট্রেন্ ধরতে হবে। মা হাতের ধারে এটা-ওটা এনে দিতে লাগলেন।

এ সব প্রিয়তোষের পুর্বের পাতা সংসারের জিনিষ। সব নিতে গেলে সোনারপুরের ঘরের মতো তিনখানা ঘর লাগবে। তাছাড়া ওসব জিনিষের মায়াও বড় একটা নেই আর। যেগুলো না নিলে. নয় তাই নিলো।

মা বললেন, এ গুলো নিবি না?

—না।

—কেন?

—লাগবে না?

—আবার কিনবি তো দরকার পড়লে?

—না, এবার আর বাড়াবো না কিছু। ছোট ঘর—সাজাবো না আর কিছু!

ট্রেনের সময় হয়ে যেতেই বেরিয়ে পড়লো প্রিয়তোষ। এক হাতে একটি ছোট জল চৌকি, আর এক হাতে একটি বালতির মধ্যে বেলুন-চাকি, ইস্ত্রি ইত্যাদি টুকিটাকি।

মা বললেন, আবার কবে আসবি?

—ঠিক বলতে পারছি না—আসবো সময় মতো।

—মান্থ্লি শেষ হয়ে গেছে?

—আজ শেষ।

—চিঠি দিস্ নিয়ম মত।

—আচ্ছা।

একটি রিক্সা বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। বলল, যাবেন নাকি বাবু?

—ষ্টেশনে যাবে?

—যাবো।

—দাঁড়াও।

মালপত্রগুলো রিক্সায় রেখে হেঁট হয়ে মাকে প্রণাম করলো প্রিয়তোষ।

—তোর ঠিকানাটা দিয়ে যা।

—ঠিকানা?

—হ্যাঁ কোনদিন যদি মরি—একটা খবরও দিতে পারবে কেউ।

পকেট থেকে কাগজ কলম বার করে সোনারপুরের ঠিকানা লিখে মায়ের হাতে দিলো প্রিয়তোষ। এ সময় তাঁর মুখের দিকে তাকাতে চোখ দুটো ছল্-ছল করে উঠলো। তাই তাড়াতাড়ি রিক্সায় উঠে বলল, চলো—

রিক্সা ছেড়ে দিলো। মা চোখে আঁচল চাপা দিলেন।

প্রিয়তোষ অন্যদিকে চেয়ে রুমাল বার করলো পকেট থেকে। না, চোখে স্পর্শ করানো যাবে না এটাকে রিক্সাটা অন্ততঃ পথের বাঁকে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। শেষ বারের মতো আর একবার পিছন ফিরে দেখে নিলো প্রিয়তোষ—হ্যাঁ, মা দাঁড়িয়ে আছেন, অতসী এসে একটা হাত ধরেছে তাঁর।

রিক্সাটিকে কি তবে দাঁড়াতে বলবে নাকি প্রিয়তোষ? বলবে নাকি ফিরতে উল্টো পথে? না—না—না! তা' হয় না।

সোজা ষ্টেশনে এসে থামলো রিক্সা। নেমে ভাড়া মিটিয়ে ট্রেনে উঠলো প্রিয়তোষ।

কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিলো। একটি পাশে জানলা ধারে বসেছিলো সে। বাইরের দিকে চেয়ে কোন জগতে চলে গিয়েছিলো কে জানে মনে মনে।

—মাষ্টার মশাই?

প্রিয়তোষ চোখ ফিরিয়ে আর এক পাশে চেয়ে দেখলো অনিলবাবু।

—আরে, অনিলবাবু যে—কোথায় যাচ্ছেন?

—কোলকাতায়।

—তারপর ?

—ওঁরা কেউ ছিলেন না কোলকাতায়, দেশে গিয়েছিলেন। আপনার কথা বলেছি সব ওঁদের—একদিন আসুন না বালিগঞ্জে।

—কবে ?

—কাল আসুন।

—কখন ?

—যখন হোক, আমি সারাদিন থাকবো কাল ওখানে।

—আচ্ছা যাবো। দিন, ওঁদের ঠিকানাটা দিন।

অনিলবাবু ঠিকানা দিলেন লিখে। কাগজের টুকরোটি পকেটে রেখে আবার বাইরের দিকে তাকালো প্রিয়তোষ।

গাড়ি চলছে—চলছে তার মনও সুদূর ভবিষ্যতের পথে পথে। একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ যেন ওর জন্যই অপেক্ষা করে আছে। সে আসতেই তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিল তাই।

গাড়ি এক সময় সোনারপুর এসে থামলো। হাত ঘড়ি দেখলো প্রিয়তোষ। বেলা দু'টো কুড়ি। নেমে পড়লো দু'হাতে দুটো বোঝা নিয়ে।

বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুঁচলো। এবার সে প্রতিজ্ঞাই করে বেরিয়েছে বাড়ি আর ফিরবে না বলে। তার সবাই থাকলেও, মনে-মনে তো সে একাই।

কেন আর তবে ওদের সংগে জড়িয়ে থাকা! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়তে হবে ওর জীবনটাকে—হ্যাঁ, চালিয়েও নিতে হবে।

ক'মিনিটের মধ্যে ঘরে এলো প্রিয়তোষ। ওর পাশের ঘরের প্রতিবেশি ছুটির দুপুরে দিবা নিদ্রায় মগ্ন।

তার দরজার বাইরে বারন্দার উপরে পা ছড়িয়ে গায়ের কাপড় নামিয়ে বসেছিল বাড়িউলি। পাশেই তার মেয়ে খেঁদি।

খেঁদির বিয়ে হয়েছে তিন চার বছর। স্বামী কোনও অফিসের পিওন। মাস গেলে নির্দিষ্ট তারিখে মাইনে আসে ঘরে। সেই গৌরবে মাতা, পুত্রী দু'জনে গৌরবান্বিতা।

ক'দিন হলো খেঁদি এসেছে বাপের বাড়িতে। ওদের মায়ে-ঝিয়ের কথা বার্তার মাঝে বুঝেছে প্রিয়তোষ সে গৌরবের কথা অনেকবার। ওদের এতোক্ষণ হয়তো সেইরকম কিছু আলোচনা হচ্ছিল সোহাগীর সঙ্গে।

প্রিয়তোষ এসে নিজের ঘরের দরজা খুলতেই বাড়িউলি বলে উঠলো, ছেলে কি বাড়ি গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কে-কে আছে বাড়িতে ?

—সবাই আছে !

—খেয়ে এসেছো ওখান থেকে, না রাঁধবে ?

—এত বেলায় কেউ না খেয়ে আসে ?

খেঁদি কথা বলল এবার, দাদার কষ্ট হয় না রেঁধে খেতে ?

—না, কষ্ট আর কি ?

ঘরে ঢুকলো প্রিয়তোষ। খেঁদি ওর মাকে বলল, দাদা বেশ সোন্দর গোছানি না—কেমন গোছ্-গাছ করে সব রেখেছে! তোমার জামাইও এই রকম—একটুও নোংরা দেখ্তে পারে না।

বাড়িউলি কিছু বললো না।

সোহাগী সুযোগ পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, দাদা, একলা এলে—তা' বৌদি কোথায় ?

বিরক্তি ভরে জবাব দেয় প্রিয়তোষ, নেই।

—ওমা সেকি !

খেঁদি বলে, হ্যাঁ, বে, করেনি।

—তা' মদ্দলোকের আবার বে'র ভাবনা—করলেই হ'লো।

প্রিয়তোষের ভাল লাগে না এসব আলোচনা শুনতে। বিশেষ-করে সোহাগীর মুখের কথাগুলো যেন সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মতোই মনে হয় তার। প্রসঙ্গ এড়াতে দরজার পরদাটা ফেলে দিলো সে। ওটা কপাটের উপর তোলা ছিল।

ওদের আলোচনা চলতে লাগলো। আলোচ্য বিষয়টা গ্রাম্য মেয়েলি বিষয় নিয়ে।

ওদিকে কান না দিয়ে জামা কাপড় ছাড়লো প্রিয়তোষ। লুঙ্গি প'রে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিলো। জল চৌকিটা পেতে বাক্স সুটকেস তার উপর রাখলো। তারপর ঘর ঝাঁট্ দিয়ে কল থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে শুয়ে পড়লো।

শরীরটা ক্লান্ত। মন অবসন্ন বাড়ির চিন্তায়। মা—ভাই—

ভাইয়ের বৌ। সবার কথা মনে পড়ছে। হয়তো আর একবার ভুল করলো সে বাড়ি ছেড়ে। কিন্তু এখন উপায় কি?

অনিলবাবু কাল যেতে বলেছেন বালিগঞ্জে। যদি হয়েই যায় ট্যুইশানিটা তা'হলে এ ঘর সংসার দেখবে কে? ইস্ আর দশ-পনেরটা দিন আগে যদি দেখা হ'তো অনিল বাবুর সঙ্গে তা'হলে ঘর নিতো কে—জিনিস পত্রও কিছু আনতো না বাড়ি থেকে। এখন পেয়েও এ ট্যুইশানি নেওয়া যাবে না হয়তো। কারণ, এ জিনিষপত্র আর বাড়িতে ফিরিয়েও দিয়ে আসা যাবে না।

ট্যুইশানিটা হ'লো—দু'দিন আগে হ'লে ভাল হ'তো। একটা ঘর পেতো সে থাকবার জন্য। দু'বেলা রান্নার ঝামেলা থাকতো না খাবার চিন্তা থাকতো না। বড় লোকের বাড়ি গৃহশিক্ষক হয়ে সুখেই কাটানো যেতো।

অবশ্য, যা সে ভাবছে তা না'ও হতে পারতো। এমনও হতে পারতো যে দু'বেলা খাবার জন্য পরের মুখ চেয়ে থাকতে হতো হয়তো ওকে।

না হয়েছে ভালোই হয়েছে ট্যুইশানিটা। এখানে সে স্বাধীন—ওখানে তার স্বাধীনতা না'ও থাকতে পারতো। না, নেওয়া চলবে না ওটা। কিন্তু কথা দিয়েছে যে সে অনিলবাবুকে। কী করা যায়?

অনেক ভেবে ঠিক করলো প্রিয়তোষ কাল কলেজষ্ট্রীট যাবার আগে একবার নামবে সে বালিগঞ্জে। নিক্ না নিক্ একবার দেখেই আসবে না হয় পরিবেশটা।

অনেকক্ষণ কেটে গেল শুয়ে শুয়ে।

একটু তন্দ্রা মতন এসে যেতেই উঠে পড়লো, না, এখন ঘুমুলে চলবে না। চা বসালো প্রিয়তোষ। তারপর সব ধুয়ে মুছে রেখে জামা গায়ে দিয়ে দরজায় তালা দিয়ে বেরোলো।

এলো অধীরের বাড়ি। একটি বাঁশ বনের মধ্য দিয়ে সর্টকাট্ রাস্তা। সেই পথেই এলো।

অভ্যেস মতো বাড়ি প্রবেশের মুখে ডাকলো একবার জোরে অধীরের নাম ধরে, অধীর—

—এসো!

অধীর দিবা নিদ্রা সেরে বিছানায় বালিশ পেটে দিয়ে ছড়া লিখতে বসেছিল। সেই অবস্থায় আহ্বান জানালো ওকে।

প্রিয়তোষ প্রবেশ করতেই অধীর উঠে বসলো। বলল, বসো-বসো—ঠিক সময়েই এসেছো। তারপর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, শুনেছো, প্রিয়তোষ এসেছে!

জয়ন্তী রান্নাঘর থেকে বলল, হ্যাঁ দেখেছি—

—তারপর, কি লিখছিলে?

—শুনবে?

—হোক্!

অধীর ওর ছড়া শোনাতে আরম্ভ করলো। পর—পর—শুনিয়ে গেল কয়েকটা।

চা এলো যথা সময়ে। ওর ছড়া পড়া তবু থামতে চায় না যেন! এখুনি এ মুহূর্তে প্রিয়তোষের আর ভাল লাগছিলো না শুনতে।

বলল, আজ থাক—পরে আবার শুনবো।

—কেন, ভালো লাগছে না?

—না।

—আচ্ছা, আর একটা শুনিয়ে বন্ধ করছি।

কথা রাখলো অধীর। ছড়াপড়া থামিয়ে সে'ও চায়ের কাপ ধরলো এবার। দু'বন্ধুতে কিছু সাহিত্যালোচনা চলল এরপর।

তারপর প্রিয়তোষ বলল, একটা ট্যুইশানি পেয়েছি ভালো।

—কোথায়?

—বালিগঞ্জে।

—কি রকম?

—খাওয়া-থাকা ছাড়াও হাত খরচা দেবে মাসে একশো টাকা।

—ও' তোমার পোষাবে না।

—কেন ?

—কেন জানিনা। তোমার পোষাবে না এই বলে দিলাম।

—কিন্তু কেন পোষাবে না তার তো একটা কারণ কিছু তুমি দেখাবে ?

—কারণ আবার কি! পরের বাড়ি থাকা আমাদের কি পোষায় —আমরা হলুম গিয়ে একটু আয়েসী, একটু খেয়ালী।

—তা, ঠিক। কিন্তু, ভেবে দেখো একশ'টাকা নগদ আর খাওয়া-থাকা কম নয় এ বাজারে।

—আরে রাখো তোমার ও টাকা। ট্যুইশানির টাকার কী দাম আছে ? এক দিন বলে দেবে আর দরকার নেই—ব্যাস্ হয়ে গেল। ওসব চিন্তা ছাড়ো। একটা ভাল দেখে চাকরির জোগাড় করো ওর থেকে। তারপর একটি বিয়ে করো।

—বুঝলাম। কিন্তু চাকরি পাই কোথায় ?

—চেষ্টা করো।

—করবো। যাকগে, বেরোবে ?

—হ্যাঁ বেরোবো। তুমি বেরোবে ?

—চলো ঘুরে আসি একটু ঢাকুরিয়া থেকে।

—যাও জামা কাপড় প'রে নাও গিয়ে।

প্রিয়তোষ ঘরে এলো। জামা কাপড় প'রে বেরোলোও আবার সংগে সংগে প্রায়। অধীর এলো। দু'জনে ষ্টেশনে এসে ট্রেন ধরলো। ঢাকুরিয়ায় ওদের ঘাঁটি! আগে দু'জনেই ওখানেই ছিল। বন্ধু-বান্ধব সব ওখানেই রয়ে গেছে। ওরা দু'জনে শুধু ঘটনা চক্রে এসে গেছে সোনারপুরে। অধীর বাড়িও করেছে এখানে।

দু' জায়গায় আড্ডা দিয়ে ফিরতে রাত দশটা। অধীর বাড়ি চলে গেল। প্রিয়তোষ ঢুকলো ওর ঘরে। রাতের খাবার ব্যবস্থা কিছু করতে হবে। এত রাত্রে কিছু করতেও ভাল লাগছে না—আর ঘরে নেইও বিশেষ কিছু।

তবু কিছু খেতে হবে। মোটামুটি ক্ষিদেও পেয়েছে। তাই, গোটাকত মুড়ি জলে ভিজিয়ে চিনি দিয়ে রাতের আহার করলো।

এ সময় একবার ওবেলায় বাড়ির খাবার কথা মনে পড়লো প্রিয়তোষের। না, তার ভাগ্যেই নেই ভালো মন্দ খাওয়া। এগারোটা নাগাদ শুয়ে পড়লো সে।

সকালে উঠলো ঠিক সময়ে। যথারীতি চা খেয়ে উনুন ধরালো।

চাল দু'টি বেশিই নিলো আজ। রাতের ভাতে জল দিয়ে বেখে দেবে। একটা নিরামিষ তরকারী আর আলুভাতে। সামান্য আয়োজন। তবু স্নানের পর বেশ পরিতৃপ্তি করে খেলো সে তাই। তারপর বেরোলো।

ন'টা পনেরো নাগাদ নামলো এসে বালিগঞ্জে। তেরো নম্বর ষ্টেশান রোড খুঁজে পেতে সময় লাগলো না। ষ্টেশান থেকে দেড় মিনিট দু'মিনিটের পথ।

সবুজ রঙের চারতলা বাড়ি। লোহার গেটের মধ্যে ঢুকে কয়েক পা হেঁটে বাঁয়ে ভিতরে প্রবেশের পথ। সোজা লম্বা বারান্দার দু'পাশে ঘর।

বাঁ হাতে একটি বাঁক। সেখান থেকে উঠে গেছে সিঁড়ি। আশে পাশে কলিং বেল আছে কিনা দেখলে।

হ্যাঁ, বাইরের গেটের কাছেই সেটা রয়েছে। তবু ওটা স্পর্শ না করে কি মনে হওয়ায় সোজা এক তলায় চলে এলো সে।

অনিলবাবু বলেছিলেন একতলার সিঁড়ির পাশের ঘরটিতে তিনি

থাকবেন। সব ঘরগুলি কিন্তু বন্ধ। নীচতলাটা নীরব। ঘরে ঘরে তালা লাগানো।

হঠাৎ নজর পড়লো ওর হ্যাঁ, বাঁ হাতের প্রথম ঘরটায় তালা নেই তো!

ভেজানো রয়েছে এ ঘরের দরজার পাল্লা দু'টো। তবে কি এই ঘরেই আছেন অনিলবাবু?

হ্যাঁ, দরজায় হাত দিয়ে একটা পাল্লা একটু ঠেলে দিতে খুলেও গেল। উঁকি দিয়ে দেখলো অনিলবাবু একটি তক্তপোষের উপর বসে ঝুঁকে পড়ে খেরো খাতায় হিসেব লিখতে ব্যস্ত।

ওকে দেখেই বলে উঠলেন, আসুন—আসুন!

প্রিয়তোষ ভিতরে ঢুকলো।

ওকে বসতে বলে অনিলবাবু বেরোলেন। বেরোবার সময় তিনি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেতে ভুললেন না। বাড়িটাকে কেমন যেন মনে হলো তার।

একা ঘরে বসে বসে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো সে। না ফ্যান নেই ঘরে। নেই কোন আসবাব। তক্তোপোষের উপর শুধু একটি মাদুর পাতা।

হয়তো ঘরটি কোন কাজে লাগে না—কিম্বা চাকর বাকরদের থাকবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু অনিলবাবু কি লিখছিলেন বসে? নিশ্চয় কিছু গোজামিলের হিসেব। না হ'লে এ গোপনীয়তা কেন?

অল্প পরেই ফিরলেন অনিলবাবু। তাঁর হাতে দু'কাপ চা।

প্রিয়তোষ বলল, চা কি হবে?

—খাবেন।

—আমি এক্ষুনি ভাত খেয়ে এলাম।

—তাতে কি হবে, এনে যখন ফেলেছি খেয়ে নিন।

অগত্যা চায়ের কাপটি হাতে নিতেই হলো।

অনিলবাবু চা খেতে খেতে বললেন, আপনার কথা বলেছি আমি

সব। এঁরা আপনাকে রাখবে ঠিক করেছে। কিন্তু আপনি আর একটু আগে এলেই ভালো হতো। ছোটবাবু বেরিয়ে গেলেন এই একটু আগে।

—কেন, বলে রাখেন নি ?

—হ্যাঁ, বলেছিলাম। একটা মামলা আছে কিনা তাই না বেরিয়ে পারলেন না। আপনি কাল আসুন—যেভাবেই হোক, কাল আমি আটকে রাখবো। কথাবার্তা সামনা-সামনি বলে নেওয়াই ভাল—কি বলুন ?

—হ্যাঁ।

প্রিয়তোষ উঠলো। ষ্টেশানে এসেই ট্রেন পেয়ে যেতেই উঠেও পড়লো। কলেজষ্ট্রীট পৌঁছতে একটু দেরি হলো। হোক, আজ কোন প্রুফ্ ছিল না বাড়িতে।

শনিবারের সব প্রুফ্ এখানে বসেই দেখে দিয়ে গেছে। আজ প্রেসের প্রুফ্ এখন কারো আসবে না এক যদুবাবুর ছাড়া। ওখানেই গেলো প্রথমে।

না, প্রুফ্ আসেনি এখনও। বসলো। যদুবাবু কাউন্টারের উপরে কতগুলি বই পাঁচটি-পাঁচটি করে সাজিয়ে-সাজিয়ে রাখছিলেন।

ওকে দেখেই বললেন, এত দেরিতে এলে চলে ?

—কি করবো তাড়াতাড়ি এসে—আপনার প্রুফ্ তো আসেনি।

—যদি এসে যেতো ?

—কাল রবিবার গেছে। আমি জানি আজ এত তাড়াতাড়ি কোন প্রুফ্ আসতে পারে না।

—এখন আবার রবিবার কি ? সিজেন টাইম। সব প্রেসেই ওভার টাইম চলছে এখন। দিন একটা সিগারেট দিন দেখি—

প্রিয়তোষ সিগারেট বার করলো।

কিছুক্ষণ কাটলো। কিন্তু বসে থাকলে ওর চলে না। সে বেরোলো। আর এক চক্কর ঘুরে এলো বইপাড়ার তার অন্য পার্টিদের কাছ থেকে।

না, কোথাও কিছু নেই। কাজ না হলে পয়সাও নেই—পয়সা না এলে আয় নেই। খরচ বাড়ছে দিন-দিন। তাছাড়া খাটা কেন যদি না সাধারণভাবেও অন্ততঃ খেয়ে পরে বাঁচা যায়। অবশ্য, বেঁচে তো আছেই সে সশরীরে তবু, এ বাঁচাকে কি বাঁচা বলা যায়?

উপায় কই বাঁচবার—সত্যকার মানুষের মতো বাঁচবার? দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চরম। ব্যবসা-বাণিজ্য অচল। কল-কারখানা বন্ধ। চারিদিকে বিদ্রোহ, বিপ্লব। একটা পরিবর্তন একদিন আসবেই—কিন্তু কবে?

যদুবাবুর কাছে এলো প্রিয়তোষ। আজকাল আর এখানে ভাল লাগে না ওর।

না এসে তবু উপায় কী—বসবার জায়গা নেই কোথাও। সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকতেও হবে—সময়টা কাটাতে হবে বাধ্য হয়ে তাই যদুবাবুর এখানে। অবশ্য, এজন্য যদুবাবু যতখানি সুবিধা আদায় করে নেওয়া যায় নেবেনই ওর কাছ থেকে।

বালিগঞ্জের কথা মনে হলো প্রিয়তোষের। ট্যুইশানি হয়তো হয়েই যাবে। হলে নিয়ে নেবে কি সে? পরের বাড়িতে গিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যাবে না সবক্ষেত্রে।

তবু, খাওয়া থাকার দিক দিয়ে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কিন্তু ঘর, না ঘর ছাড়া যাবে না চট্ করে। যদি শেষ পর্যন্ত বালিগঞ্জে না টেঁকা যায় তখন দাঁড়াবে কোথায়?

ভাবতে ভাবতে একটা মতলব এলো মাথায়। সময় কাটাবার একটা সুন্দর সুযোগ করা যায় আপাততঃ।

মানিকতলার দিকে দিদির বাড়ি। দুপুরটা ওখানে কাটিয়ে এলে কেমন হয়! গল্প-গুজব করে চা খেয়ে বিকেলের দিকে আসা যাবে। তাছাড়া একটা পরামর্শও করা যাবে বালিগঞ্জের ব্যাপারে।

উঠলো প্রিয়তোষ।

হাঁটতে হাঁটতে এলো শেষ পর্যন্ত মানিকতলায়। অনুরাধা ঘুমোচ্ছিল খাওয়া-দাওয়া সেরে। সোনা-রূপো স্কুলে। জামাইবাবু অফিসে।

কড়া নাড়তেই অনুরাধা উঠে দরজা খুলে দিল। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললো, কী ব্যাপার, তুই ?

—এলাম। এমনি এলাম একটু।

—আয়—

ভিতরে ঢুকলো প্রিয়তোষ।

অনুরাধা ওকে বসতে বলে সদর বন্ধ করে ঘরে এসে শুয়ে পড়লো আবার। প্রিয়তোষ এ ঘরেই একটা চেয়ারে বসে বললো, কী রে ঘুমোলি নাকি ?

—কেন ?

—তোর সংগে একটা বিষয় পরামর্শ করতে এলাম।

অনুরাধা বড় হলেও বেশী বড় নয় প্রিয়তোষের থেকে। মাত্র দু'বছরের ব্যবধান ওদের।, পিঠেপিঠি দু'টি ভাই বোনের মধ্যে খুব বেশি একটা মিল ছিল না ছোটবেলায়। মারামারি, ঝগড়া-ঝাঁটি করেই কেটেছে ওদের এককালে।

কিন্তু অনুরাধার বিয়ের পর থেকেই ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে উল্টো। দু'টিতে এখন খুব ভাব। দু'জনে দুজনকে এখন ওরা বন্ধু হিসেবেই মেনে নিয়েছে।

আত্মীয় স্বজন কারো বাড়ি না গেলেও প্রিয়তোষ মাঝে মাঝে এখানে আসে। নিজের ব্যাপার নিয়ে পরামর্শও করে—আলোচনা করে সব সমস্যা নিয়ে অনুরাধার সংগে। সব সময় যে সবকথা মানে ওর তা নয়, তবু কিন্তু গোপন করে না দিদির কাছে কিছু।

অনুরাধা শোয়া অবস্থায় বললো, কি বিষয় আবার নিয়ে এলি আজ ?

প্রিয়তোষ বললো, ঘুমোলে বলি কি করে ?

—না ঘুমোচ্ছি না, তুই বল।

—তা'হলে উঠে বস!

অনুরাধা উঠলো। বললো, ব্যাপারটা কি শুনি—বলি, প্রেমঘটিত কিছু নয়তো ?

—দূর, তুই আছিস তোর তালে—প্রেম করতে কি আবার পরামর্শ করতে হয় নাকি ?

—তা'হলে কি ?

—একটা ভালো ট্যুইশানি পেয়েছি।

—কোথায় ?

প্রিয়তোষ বালিগঞ্জের কথা সব বললো অনুরাধাকে। সব শুনে অনুরাধা ওকে বললো, তুই কি ঠিক করেছিস্ ?

—কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না।

—এ'দিকে যদি চালাতে না পারিস, তাহলে নিয়ে নেওয়াই ভালো। কিন্তু পারলে নিস্ না। কথায় বলে, "পরভাতি হয়ো তবু পর ঘরী" হয়ো না।

দুজনে যুক্তি তর্ক চললো এরপর অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত তবু সমাধান একটা এলো না। প্রিয়তোষ উভয় দিকেই থাকতে চায়—একটা ছাড়লে ওর চলে না। অথচ উভয় দিক কি করে বজায় রাখা যায় ?

এক সময় সে বললো, যাক, যা হয় হবে—কাল যাই তো আগে, তারপর ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে কি বল ?

—হ্যাঁ, তাই ভালো। বস্, আমি চা বসাই।

অনুরাধা উঠল। বললো, কিছু খাবি তো ?

—হ্যাঁ।

প্রুফ্ নিয়ে সাতটার মধ্যে কলেজষ্ট্রীট্ থেকে বেরোল প্রিয়তোষ। আজ আর কোথাও কিছু পাবার সম্ভাবনা নেই। তাই সোজা শিয়ালদহে এসে ট্রেনে চাপলো!

পথটুকু প্রত্যহ হেঁটে যাতায়াত করে সে। সময়টাও মাপা হয়ে গেছে। কুড়ি মিনিট। দু'এক মিনিট কম বেশি হতে পারে। তাই হাঁটার গতি ঠিক রাখে।

হ্যাঁ, সাতটা কুড়ির গাড়ি পেয়ে গেল। গাড়িটা ঠিক সময়ে আজ আসায় পৌনে আটটার মধ্যেই সোনারপুরে নামা গেল। নির্দিষ্ট পথটুকু হেঁটে আসতে অন্যদিনের থেকে একটু বেশি সময় লাগলো আজ। নানারকম চিন্তা করতে করতে ধীরে ধীরে হাঁটছিল সে।

পিচ্ রাস্তা থেকে কয়েক গজ কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। ওই কাঁচা রাস্তার বাঁ পাশে স্যাকরার দোকানটিতে আড্ডা চলছে।

ডানপাশে মদের দোকানটি। বড় বড় মৃৎ পাত্রে পণ্য সম্ভার নিয়ে দোকানদার বসেছে পথের উপরে প্রায়। তাকে গোল করে ঘিরে জন দশ বারো খদ্দের। প্রত্যেকের হাতে একটি করে কাঁচের গ্লাস একই সাইজের—মদ গিলছে সবাই।

মুখে কিন্তু কথা নেই কারো। সব চুপ চাপ আপন-আপন কর্মে ব্যস্ত। ওদিকে তাকাতেই নাকে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এসে ধাক্কা মারলো। কোন রকমে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল প্রিয়তোষ। কিন্তু বাড়ির ভিতরে প্রবেশের মুখে বাধা পেলো হঠাৎ। সে থামলো একটু।

ভিতরে লঙ্কা কাণ্ড চলছে তখন বাড়িওয়ালা এবং বাড়িউলির মধ্যে। বাড়িউলির গলা প্রতি কথাতেই সপ্তমে থাকে। হয়তো স্বামীর বধিরতাই এর আসল কারণ। তবু তা আর একটু খাদে থাকলেও চলতে পারতো।

বলছে, চাই না আমি টাকা, আমার ছেলেকে টিপিশানি পড়াক্। টাকা তোর ছ্যাদ্দে নাগবে—পিচেস্!

বাড়িওলা বললো, টাকা সব আমি খাই—না?

—তুই খাস্না তো কি, আমার গত্তে যায় সব? নেমক হারাম, ছোট লোক—নজ্জা করেনি কথা বলতে? আমি বলে খেটে খেটে গতর কালি করলাম। উনি খাবার খোটা দিচ্ছেন। টাকা আমি খাচ্ছি না তোর বাবারা খাচ্ছে, হ্যাঁরে ড্যাক্রা? নজ্জা করে না কথা বলতি—তুই জন্ম দিচ্ছিস, খাওয়াবিনি? কম্ম করবিনি? এলে গলা দে তুই—গলা দে? আমি হ'লে এত্তক্ষুন্ এলে (রেলে) গলা দিতুম—কথা বলতুমনি বড় মুখ করে!

—ফের, তুই কথা কইছিস্?

—কইবুনি—কেন, তোবে দেখি ভয়?

—ফের মাগি চেঁচাচ্ছিস্?

—একশোবার চেঁচাব। যা তুই যা পারিস্ কর্‌গে যা—মর্‌গে যা মদ্দ!

প্রিয়তোষ আর বাইরে দাঁড়াতে পারলো না। প্রয়োজন মত শুনতেই হবে বলে মনকে প্রস্তুত করে এক সময়ে সে ভিতরে প্রবেশ করলো। সংগে সংগেই আগুনে জল পড়লো যেন। দু'জনে চুপ হয়ে গেল মুহূর্তেই।

সে তালা খুলে ঘরে ঢুকলো। যথারীতি আলো জ্বেলে কাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম করবার জন্য শুয়ে পড়লো।

প্রুফ্ দেখতে হবে রাত জেগে তারপর খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তে হবে বারোটা-একটার মধ্যে—ওদিকে সকালে ওঠার তাড়া আছে।

কিন্তু আজ চট্ করে হাত মুখ ধুতে যেতে ইচ্ছে করলো না। শুয়ে শুয়ে নিজেকে ভাবতে লাগলো সে।

এই পরিবেশে বাস করবে সে কেমন করে? কিন্তু উপায় নেই ভালো পরিবেশে যাবার? প্রথমতঃ ভাড়ার প্রশ্ন, দ্বিতীয়তঃ সমতা রক্ষা কোনটাই সম্ভব নয় তার পক্ষে। আয় সামান্য—তা আবার সবটুকু অনির্দিষ্ট। এর উপর ঝুঁকি বাড়ানো চলে না। অথচ—

না, কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল না অনেকক্ষণেও। এদিকে রাত বাড়ছে। অগত্যা এক সময় উঠে পড়তে হলো তাকে। ভবিষ্যতে যা হয় হবে ভেবে যথারীতি সব কাজগুলো পর পর সেরে প্রুফ্ দেখতে থাকলো এক সময়।

শুতে অনেক রাত হলেও ঠিক সাড়ে পাঁচটায় উঠে পড়লো প্রিয়তোষ সকালে। ঘড়িতে এলার্ম দেওয়াই ছিল।

এখনও ভালো করে সকাল হয়নি। শীতের সকাল যেন কুয়াশার কাঁথা ছেড়ে বেরোতেই চায় না।

তবু তার জন্য বসে থাকলে ওর চলে না। বিছানা তুলে চায়ের জল চাপিয়ে মাজন হাতে বাইরে আসতেই হলো তাকে।

তাড়াতাড়ি সারতে হবে সব—রান্না করা, বাসন মাজা, জলতোলা, ঝাঁট দেওয়া, স্নান খাওয়া আরও কত কি। সবচেয়ে বড় ভাবনা কলেজষ্ট্রীট্ যাবার আগে একবার বালিগঞ্জে নামতে হবে আজও।

চটপট হাতের কাজগুলো সেরে নিলো প্রিয়তোষ। তারপর রান্না বসালো। এক তরকারী ভাত—যাহোক একটা কিছু ভাতে সেদ্ধ?

এর জন্যে ঝামেলা কত।

হ্যাঁ সব সারলো সে দ্রুতবেগে। খেতে বসে দেখলো তরকারী কাঁচা রয়ে গেছে। থাক, এরকম খাওয়া ওর অভ্যেস আছে।

বেরোলো অন্যদিনের চেয়ে একটু আগে। কিন্তু স্টেশনে এসে গেল মেজাজটা বিগড়ে।

ট্রেন লেট। উপায় নেই অপেক্ষা না করে। প্রবল বিরক্তিতে ভরে গেল মন। স্টেশনের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত কয়েকবার পায়চারি করে কাটালো সে। শেষে ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলো এক জায়গায়। এভাবে প্রায় চল্লিশ মিনিট কাটিয়ে ট্রেন পাওয়া গেলো। তা'ও ওঠা মুস্কিল—অফিস টাইমের ভিড়।

অন্য দিন হলে এ গাড়ি ছেড়ে দিতো প্রিয়তোষ। আজ ছাড়লো না। বাদুড় ঝোলার মতো ঝুলতে ঝুলতে চললো। একসময় এসে নামলোও বালিগঞ্জে।

ক'মিনিটের মধ্যে স্টেশন রোডের বাড়িটিতেও পৌছানো গেল। অনিলবাবু নীচতলার ঘরটিতেই ছিলেন।

সে প্রবেশ করতেই বললেন, বসুন!

তারপর খাতাপত্র গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, চলুন। ওঁকে অনুসরণ করে ত্রিতলে এসে থামলো প্রিয়তোষ একটি ঘরের দরজায়।

বড়লোকের বাড়ি। মোজাইক করা মেঝে। আসবাব-পত্রের বালাই তবু বেশি ছিল না ঘরটায়। একধারে একটি তক্তপোষ অন্য ধারে একটি টেবিলের উপর রেডিও। গুটি দুই গদি আঁটা চেয়ার।

অনিলবাবু ভিতরে প্রবেশ করে ওকে আহ্বান জানালেন, আসুন!

প্রিয়তোষ ঘরে ঢুকে একটি চেয়ারে উপবেশন করলো।

অনিলবাবু এবার উঠে এঘর ওঘর ঘুরে একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, বসুন একটু, ছোটবাবু আসছেন।

প্রিয়তোষ বলল, আমার যে তাড়াতাড়ি ছিলো একটু—অফিস যেতে হবে।

—এই এখ্খুনি আসছেন—বাথরুমে ঢুকেছেন।

—ওঃ, আচ্ছা।

হাত ঘড়িটা দেখলো প্রিয়তোষ। এগারোটা দশ। গুটি দুই

ছেলেমেয়ে এসময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে এসেই ওকে দেখে থমকে দাঁড়ালো দুয়ারের ধারে।

অনিলবাবু বললেন, এরাই আপনার ছাত্র!

প্রিয়তোষ শুধরে দিল ওঁকে, ছাত্র নয় শুধু—বলুন, ছাত্র-ছাত্রী।

—ওঃ,হ্যাঁ-হ্যাঁ।

বলেই, হাসতে-হাসতে অনিলবাবু উঠে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।

প্রিয়তোষ ছেলেমেয়ে দু'টিকে ডাকলো, তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, এদিকে এসো!

ছেলেটির বয়েস তের-চোদ্দ, মেয়েটির ন' দশ। ছেলেটির স্বাস্থ্য ভালো। অর্থাৎ, নাদুশ-নুদুশ। মেয়েটি রুগ্না। তবে সুশ্রী। দুজনেই ফরসা। চেহারায় বড়লোকী জৌলুষ খানিকটা প্রকাশ পাচ্ছে বৈকি।

ছেলেটি এগিয়ে এলো কাছে। মেয়েটি দাঁড়িয়েই রইলো পূর্বের স্থানে একটা।

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি?

—দীপক।

—কোন ক্লাশে পড়ো?

—ফাইভে।

—আর, ও'?

—ফোরে।

—বাঃ, বাঃ! তা' তোমার নামতো দীপক—ওর নাম?

দীপক বোনের নাম বললো না। ওকে ডাকলো, এই, এদিকে আয় না!

মেয়েটি এগিয়ে এলো এবার। প্রিয়তোষের চেয়ারের পাশে এসে থেমে একটি হাতলে দুটি হাত রেখে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো। ওর হাত দুটি নিজের দু'হাতে ধরে প্রিয়তোষ বললো, কই, তোমার নামটাতো বললে না?

খুব ধীরে জবাব দিলো এবার মেয়েটি, অঞ্জু।

—বাঃ বাঃ, বেশ নাম তোমার—তা' তোমার কোন ক্লাশ?

—ফোর।

আর একটি মেয়ে এলো এ সময় এ ঘরে। সে এসে চেয়ারের আর এক পাশে দাঁড়ালো।

এ মেয়েটি অঞ্জুর চেয়ে ছোট। বয়েস ছয় সাত। প্রিয়তোষ ওকেও নাম জিজ্ঞেস করলো। এ মেয়েটি অঞ্জুর মতো লাজুক বা ভীতু গোছের নয়।

—স্পষ্টই জবাব দিল, অমিতা।

—তুমি কোন ক্লাশে পড়?

—ওয়ানে।

—অ, আ, ক, খ এগুলো পড়তে পারো?

—হ্যাঁ।

—লিখতে পারো?

অমিতা এবার চুপ করে গেল। তার মাথাটা ঝুঁকে পড়লো। প্রিয়তোষ অভয় দিলো ওকে, লজ্জা কি, পারো না—শিখবে!

অঞ্জু বলল, ও, ওয়ানে পড়ে না—ইন্‌ফ্যান্টে পড়ে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ দু' বছর আছে একই ক্লাশে।

—সে কি?

—হ্যাঁ, স্কুলেই যায় না।

এমন সময় ছোটবাবু প্রবেশ করলেন ঘরে। স্নান করে ভিজে লুঙ্গি প'রা অবস্থায় গা' পুছতে পুছতে এসেছেন। ওই অবস্থাতেই দ্বিতীয় চেয়ারটিতে বসে পড়ে বললেন, মাষ্টার মশাইর নাম কি?

নাম বললো প্রিয়তোষ।

—বসুন। কাপড় পড়ে আসি।

—নিশ্চয় নিশ্চয়!

ছোটবাবু উঠে পাশের ঘরে গেলেন এবার কাপড় ছাড়তে। অঞ্জু, দীপক ও অমিতা ওরাও দূরে গিয়ে দাঁড়ালো এবার।

অনিলবাবু ফিরলেন। তক্তপোষটির উপর বসে বললেন, যা হয় কথা বলে নিন ছোটবাবুর সংগে। যোগাযোগ করে দিলুম—এবার আপনারা কথা বলুন।

—কেন, আপনি থাকবেন না এর মধ্যে?

—না।

—আচ্ছা তাই হবে।

ছোটবাবু এলেন। কাপড় প'রে এসেছেন একটি দু' ভাঁজ করে। মাথা আঁচড়াননি—খালি গা'। পূর্বের চেয়ারটিতে বসে বললেন, মাষ্টারমশাই এর আগে আর ক'টি ছেলে মেয়ে কে মানুষ করেছেন?

—তা' করেছি কয়েকটা।

—এদের পারবেন পড়াতে?

—কেন পারবো না?

—মানে, এরা পড়তে চায় না মোটেই। আমিও পারি না নজর দিতে—আপনাকে কিন্তু নিজের মতো মনে করেই পড়াতে হবে।

—সে যা' হয় হবে। তা' মাথা কি রকম?

—মাথা? একেবারে নেই।

—ভুল বলছেন। মাথা সব ছেলে মেয়েরই থাকে। আমার মনে হচ্ছে এদের ঠিক মতো চালনা করতে পারছেন না আপনারা!

—সেইজন্যেইতো আপনাকে আনা। দেখুনতো যদি পারেন এগুলোকে মানুষ করতে—আমিতো একেবারে হালই ছেড়ে দিয়েছি। মানে, পিটোতে হবে একধার থেকে—পারবেন তো?

—এবার কিন্তু মুস্কিলে ফেললেন আপনি আমাকে। মার ধোর ও আমার দ্বারা মোটেই হবে না। তবে না মেরে যাতে

মানুষ করা যায় তা আমি পারবো। কিন্তু সব ভার ছেড়ে দিতে হবে আমার উপর। দরকার হলে খেলাধূলার মাধ্যমে, গল্প বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে পড়াতে হবে এদের। মার ধোর করে এদের কিছুই হবে না।

—দেখুন চেষ্টা করে।

অনিলবাবু এ সময় কথা বলে উঠলেন, তা' উনি পারবেন। আমার ছেলেকে তো উনিই পড়িয়েছেন তিনবছর।

প্রিয়তোষ বললো, হ্যাঁ, তারতো মাথাই ছিল না। এদের সংগে কথাবার্তা বলে যা বুঝলাম তাতে মনে হচ্ছে এরা ভালোই রেজাল্ট্ করতে পারবে।

যে ঘরে বসে ওদের কথাবার্তা চলছিল সে ঘব আর পাশের ঘরের মধ্যকার দরজার পর্দার ধাবে কখন যে ছাত্র-ছাত্রীদের জননী এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রিয়তোষ বুঝতে পারেনি। এখন পারলো ওঁব কণ্ঠ শুনে।

উনি বলে উঠলেন হঠাৎ ওখান থেকেই, মাষ্টার মশাই পান খান?

—পান? ওদিকে না তাকিয়েই প্রিয়তোষ বলল, তা' খাই দু'একটা মাঝে মাঝে—মানে নেশা টেশা নেই। তবে, চা কিন্তু আমি খুব বেশি খাই। আমি এ বাড়ি এলে আপনারা আর কিছু দিন আর না দিন, চা দেবেন কিন্তু বেশি করে।

ছোটবাবু বললেন, ভালোই হয়েছে—আমার এবার একটু সুবিধেই হবে। আমার মশাই এককাপ দু'কাপের বেশি জোটে না এ বাড়িতে। কি কোরবো লুকিয়ে চুরিয়ে দোকান থেকেই সেরে ফেলি দরকারটা ইচ্ছেমতো। বেশি চাইলেই বলবে শরীর খারাপ হবে, অম্বল হবে—

কথাটা যাকে ঠেস্ দিয়ে বলা হলো তিনি বুঝলেন ঠিকই। মাঝপথেই বাধা দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, আমি ইচ্ছে করে দিই না চা খেতে—নিজেই তো বলে ঘুম হয় না, অম্বল হয়!

—তা' মাষ্টারমশাইকে চা দিয়েছো? ছোটবাবু তাকালেন গৃহিণীর মুখের দিকে।

প্রিয়তোষ হাতঘড়ি দেখলো। বেলা বারোটা। বললো, এখন আমি চা খাবো না—এই তো ভাত খেয়ে এলাম।

এ সময় চাকর জাতের একটি ছোকরা দু'কাপ চা ও বিস্কুট নিয়ে আভির্ভূত হলো আচমকা।

ছোটবাবু বিস্মিত হলেন, তুই খবর পেলি কি করে?

অনিলবাবু বললেন, আমি বলে এসেছিলুম।

প্রিয়তোষ বললো, আমি চা খাবো না।

—আরে খানতো মশাই। আপনিতো বড় চা-খোর—আপনার আবার আপত্তি?

বলেই, 'অনিলবাবু উঠে একটি কাপ নিজে নিলেন। অপরটি ও বিস্কুটের প্লেটটি প্রিয়তোষের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

অগত্যা নিতেই হলো চা। ছোকরাটি প্রস্থান করলো।

ছোটগিন্নী পান আনতে গিয়েছিলেন। এখন তা' এনে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, তা মাষ্টার মশাইকে কি দিতে-টিতে হবে?

অঞ্জু ওরা দরজার ধারে দাঁড়িয়েই ছিল।

প্রিয়তোষ ওদের বললো, যাও তোমরা এখন অন্য জায়গায় যাও।

ওরা সংগে-সংগেই প্রস্থান করলো। ছাত্রদের সামনে তাদের পড়ানোর বেতন সম্বন্ধে আলোচনায় ওর আপত্তি। তাই ওদের দূরে সরিয়ে দিল প্রথমে। তারপর ছোটবাবুর পানে চেয়ে বললো, আমার যা বলবার তা' তো অনিল বাবুকেই বলেছি।

ছোটগিন্নী বললেন, তবু আপনি বলুন!

অনিলবাবু বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সামনা-সামনি বলে নিন।

প্রিয়তোষ বলল, শ'খানেক দেবেন আর কি!

ছোটবাবু এ সময় উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন। ছোটগিন্নী বললেন, একশ'টাকা খুব বেশি হলো না কি!

—বেশি আর কি। বুঝতেই তো পারছেন, আজকালকার

দিনে ভদ্রভাবে বাঁচতে গেলে টাকা ক'টা কিছুই নয়। তা'ছাড়া, তিন জনকে সকাল বিকেল চার-পাঁচ ঘণ্টা অন্ততঃ পড়াতে হবে। প্রয়োজন না মিটলে মন দিয়ে পড়াবো কি করে?

—তা' ঠিক। কিন্তু তিনজনতো নয়। সকালে আপনি একজনকে পড়াবেন। মেয়ে দু'টোর সকালে স্কুল। বিকেলে তিনজন পড়বে অবশ্য। এজন্য একটু কমান।

ছোটগিন্নী তাকালেন প্রিয়তোষের মুখের দিকে। যুক্তিটা না মেনে পারলো না প্রিয়তোষ। সে জানতো সবাই দু'বেলা পড়বে। মেয়ে দুটির যে সকালে স্কুল তা সে জানতো না। এখন জানতে পেরে বললো, তা'হলে কিছু কম দেবেন।

—তবু আপনি যাহোক বলুন।

—তা'হলে আশি টাকা দেবেন।

কিছুক্ষণ দর কষা-কষি যুক্তি-তর্ক চললো এর পরে। কিন্তু একটা মীমাংসা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত টাকার অঙ্কটা ঠিক করবার ভারটা ছোটগিন্নীর উপর ছেড়ে দিলো প্রিয়তোষ। উনিও বোধহয় হঠাৎ কিছু একটা ঠিক করতে না পেরে বাইরে গেলেন হঠাৎ।

সেখান থেকেই ডাকলেন, অনিলদা।

—আইজ্ঞা।

—শুনুন।

অনিলবাবু উঠে বাইরে চলে গেলেন তখুনি। দু'জনে ফিসফিস্ করে কী সব পরামর্শ করতে লাগলো যেন।

প্রিয়তোষ বিরক্ত হলো। এভাবে দর কষাকষির সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। এখন যাহোক একটা অঙ্কের কথা শুনতে পেলেই সে ওঠে।

ভাবে, ওঁরা যা খুশি বলুন—ট্যুইশানি নেওয়া না নেওয়াটাতো তার হাতে। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। কলেজষ্ট্রীট যাবার জন্য উস্‌খুস্ করতে লাগলো সে।

একটু পরে অনিলবাবু ফিরে এলেন।

বললেন, ছোড়দি কি বলছেন শুনুন মাষ্টার মশাই।

—বলুন।

—উনি বলছেন খাওয়া থাকাতো ওঁরা দেবেনই। চা জলখাবারও পাবেন সব। আর নগদ ষাট টাকা দেবেন।

—কিন্তু এতে আমার পোষাবে কি করে বলুন? জানেনতো, চাকরি-বাকরি কিছু করি না আমি। কলেজষ্ট্রীটে যা কাজ করি তা' অনির্দিষ্ট। তাই শ'খানেক টাকা হলে কোন ভাবনা ছিলো না আর। দিব্বি পড়াতাম দু'বেলা—অবসর মতো বসে লেখাপড়া করতাম।

—তা' এক কাজ করুন না আপনি। দুপুরে তো কোন কাজ থাকছে না আপনার। চাকরিও হলো, পড়ানোও হলো। কাজেই ষাট টাকা কম হবে না আপনার।

—তা' আর একটু বিবেচনা করতে বলুন না। মানে আরো গোটা দশেক টাকা বাড়িয়ে দিতে বলুন। সত্তর টাকা পেলেও আমার চলবে।

অনিলবাবু আবার বাইরে গেলেন পরামর্শ করতে। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, ছোড়দি বললেন, আপনার কথাও থাক এঁদের কথাও থাক—ওই পঁয়ষট্টি টাকাই দেবেন।

—কিন্তু—

—না, আর বলবেন না।

—আচ্ছা, সে যা হয় হবে।

ছোটবাবু এ সময়ে ঘরে ঢুকলেন আবার। বললেন, মাষ্টার মশাই তা'হলে কবে আসছেন?

প্রিয়তোষ বলল, হ্যাঁ, আর একটা কথা—আমি সম্পূর্ণ একলা একটা ঘর পাবোতো?

—হ্যাঁ, তা পাবেন। মানে, এখন আপনাকে একটু কষ্ট করে এ ঘরেই থাকতে হবে। আমি শীগ্‌গিরেই ও বাড়ি চলে যাবো। তখন আপনাকে আলাদা একটা ঘর দিয়ে দেবো।

—ও বাড়ি মানে?

—আমাদের কালীঘাটে আর একটা বাড়ি আছে। মানে, এটা আমার দাদার অংশে পড়েছে। ওটা আমাদের দু'ভায়ের। ওখানে গেলে কোন অসুবিধেই হবে না। এখনও চার-পাঁচটা ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে। ওগুলো আর ভাড়া দেবো না—আপনার ঘরের অভাব কি—বিরাট পাঁচতলা বাড়ি!

—না, তা' হলে আর অভাব কি? তা' কবে যাচ্ছেন ও বাড়ি?

—এই মাসেই যাবো ভাবছি!

—তা' আমি কোন বাড়িতে আসবো?

অনিলবাবু বললেন, আপনি এখানেই চলে আসুন—এখানে এলে আপনাকে ও বাড়ি নিয়ে যাবো আমরা।

—আমি কি একেবারে বাক্স-বিছানা নিয়েই আসবো?

—হ্যাঁ, তাই আসুন।

—আচ্ছা।

—তা কবে আসছেন?

ছোটগিন্নী প্রবেশ করলেন আবার পাশের ঘরে।

ছোটবাবু অমনি হুকুম করলেন অনিলবাবুকে, পাঁজিটা কোথায় দেখুনতো অনিলবাবু—দিনটা দেখে দিই। একটা ভালো দিন দেখে আরম্ভ করাই ভালো, আপনি কি বলেন মাষ্টার মশাই!

মনে-মনে পাঁজিতে রাজি না থাকলেও মুখে বলতেই হলো প্রিয়তোষকে, হ্যাঁ, তা ঠিক।

পাঁজি এলো যথা সময়ে। ছোটবাবু ও অনিলবাবু দু'জনে মিলে দিন দেখে বললেন, সোমবার একটা ভাল দিন আছে। মহেন্দ্রযোগ বেলা ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত। ওই সময়ের মধ্যে চলে এসে একটু আরম্ভ করে দেবেন তা'হলেই হবে।

—আচ্ছা।

প্রিয়তোষ উঠলো।

ছোট গিন্নী দোরগোড়া থেকেই বললেন, তা'হলে ওদিন আসছেনতো মাষ্টার মশাই?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ।

—দেখুন যদি পারেন মানুষ করতে। একদম বদ্‌মাইস্ সব—মোটে পড়বে না।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ পড়বে—পড়বে না কেন? আসলে পড়ার রস একবার ধরিয়ে দিতে পারলে দেখবেন ঠিক পড়বে। কিছু ভাববেন না আপনি। ও দেখবেন ঠিক করে নেবো আমি।

—হ্যাঁ, এ মাষ্টার ঠিক পারবে। আমি জানিতো—আর, সেই জন্যেইতো ওঁকে এনেছি! অনিলবাবু বললেন।

প্রিয়তোষ বলল, আচ্ছা, আজ তা'হলে আসি। নমস্কার!

ছোটগিন্নী প্রতি নমস্কার করে বললেন, তা'হলে মাষ্টারমশাই ঠিক আসছেন ওই দিন?

—হ্যাঁ।

কলেজস্ট্রীট্ যখন পৌঁছলো প্রিয়তোষ বেলা তখন একটা বেজে গেছে। যদুবাবু চটে আগুন। —এত দেরী করে এলেন, প্রেসের লোক এসেছিল।

—কেন?

—যে ছ'পাতা কম্পোজ বাকি ছিল ওটা হয়ে গেছে—ওখানে গিয়ে প্রুফ্‌টা দেখে দিলে ওরা ছেপে ফেলতে পারতো।

—তা নিয়ে এলেই পারতো!

—তা' হলে আর বই বেরোবে না।

যদুবাবু কতকগুলি পুরোনো প্রুফের বাণ্ডিল নিয়ে গোছাতে লেগে গেলেন। খানিকটা চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে পড়লো প্রিয়তোষ। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এলো অধীরের অফিসে। গল্পগুজবে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চা খেয়ে বই-এর পাড়ায় এলো আবার।

দু'জায়গায় প্রুফ্ এসে গিয়েছিল। যদুবাবুর ওখানে যেতে

ইচ্ছে করছিল না এখন। অথচ, না গেলে ওর চলে না। প্রুফ দেখতে বসবার জায়গা চাই।

প্রুফ্ দুটো দিয়ে সন্ধ্যার দিকে অবসর মিলল একটু। সারাদিন ঘোরাঘুরি ও কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে বালিগঞ্জের কথা চিন্তা করেছে সে।

না, কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি এখনও। অধীরের সংগেও পরামর্শ করেছিল। সে কোন উৎসাহ দেয়নি। অথচ, ভেবে যা হোক কিছু বার করতে হবেই এ দু'টো দিনের মধ্যে হ্যাঁ বা না।

আটটা নাগাদ কলেজস্ট্রীট থেকে বেরিয়ে পড়লো প্রিয়তোষ। এক জায়গায় নগদ কাজ করে দু'টো টাকা পেয়েছিলো। তা' পকেটেই ছিল। শরীরটা বড় ক্লান্ত। ঘোরাঘুরি সারাদিন—তার উপর চিন্তা ভাবনা। মাথাটা ধরেছে।

একটু চা খেতে পারলে হতো। কিন্তু টাকা দু'টো ভাঙাতে ইচ্ছে করছিলো না। অনেকবার সে ভাবলো এ নিয়ে। শেষ-পর্যন্ত শিয়ালদার কাছাকাছি এসে ঢুকেও পড়লো একটা খাবার দোকানে।

ধারে ও নগদে আজ প্রায় কাজ হয়েছে আট টাকার মতো। সেই খুশিতে পেটপুরে জলযোগ সেরে নিলো।

ইংরাজী জানুয়ারী মাস। বইয়ের বাজারে এখন সিজন টাইম—কিছু কাজ এখন পাওয়া যাবে প্রত্যহ। হ্যাঁ, অবস্থাটা ফিরবে হয়তো এবার একটু।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল একটু।

হঠাৎ নজর পড়লো হাত ঘড়িটার দিকে। আটটা তিরিশ। চল্লিশেই গাড়ি আছে একটা। ওটা ধরতে পারলে সওয়া ন'টার মধ্যে ঘরে ফেরা যাবে। দোকানের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো তাই। হাঁটলো একটু দ্রুত।

কিন্তু কলকাতার পথ—বিশেষ করে সন্ধ্যার শিয়ালদা'র মোড়। এপার ওপার হতে হলে পথচারীকে ভাবতে হয় অনেক—দাঁড়াতেও হয় অনির্দিষ্ট কাল। ট্রাফিক জ্যাম্। যে যেখান থেকে পেরেছে এসে পড়ছে গাড়িগুলো রাস্তার মোড়ে।

এর উপর পথচারীদের নিয়ম শৃঙ্খলা না মেনে চলায় ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

শুধু তাই নয়—ফেরিওয়ালার ভীড়— ইক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত ভাবে রেলে বিনা টিকিটে আগত গ্রাম্য আনাজ বিক্রেতাদের বসা সে জটিলতাকে জটিলতর করেছে আরো। হিম-সিম খাচ্ছে ট্রাফিক্ পুলিশ দু'টো।

আশ্চর্য, এ্যাক্‌সিডেণ্ট কিন্তু হচ্ছে না কোনদিন এখানে। না, কেউ গাড়ি চাপা পড়ছে না—কেউ মরছে না। সবাই যে যার পথ করে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক।

হঠাৎ একবার প্রিয়তোষের মনে হলো—অকারণেই যেন মনে হলো যদি ওকেও অমনি ট্রাফিক্ পুলিশ হতে হতো! এ সময়েই ঘড়ির দিকে নজর পড়তে চিন্তার জালটা ছিঁড়ে গেল। আটটা উনচল্লিশ—আর এক মিনিট।

এ ট্রেন্ মিশ্ করলে প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে পরবর্তী ট্রেন্। মরিয়া হয়ে মোড় অতিক্রম করতে চেষ্টা করলো সে এবার। না, পারলো না—বাধা পেলো। দাঁড়িয়ে পড়লো তাই।

আরও দশ মিনিট গেল এভাবে। তারপর এলো এক সময় এপারে ষ্টেশনের চৌহদ্দীর মধ্যে।

এখন আটটা পঞ্চাশ। নিয়ম মত ট্রেন্‌টা ছেড়ে যাবার কথা। তবু ট্রেনতো আজকাল প্রায় লেট্ থাকে এই আশায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো সে সাউথ ষ্টেশনের দিকে। পৌঁছে শুনলো—ট্রেনটা ছেড়ে যাওয়া দূরের কথা এখনো এসে পৌঁছয়ও নি প্লাটফর্মে।

কোথায় যেন তার কেটে নিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। তার ফলেই সব আপ গাড়ি আসতে দেরি। মাইকে ক'মিনিট পর পরই ঘোষনা করা হচ্ছে তাই ষ্টেশন অফিস্ থেকে "আপগাড়ি আসতে দেরি হওয়ার দরুন সব ডাউন গাড়ি ছাড়তে দেরি হচ্ছে।"

লোকে লোকারণ্য। ক'টা গাড়ির যাত্রী জমেছে কে জানে!

একটু নিরিবিলি বসা দূরের কথা দাঁড়াবার স্থানটুকু নেই পর্যন্ত। পায়ে-গায়ে লেগে যাচ্ছে যাত্রী-যাত্রীদের মধ্যে।

সবাই দাঁড়িয়ে আছে ওর মধ্যে। কেউ স্থান ছেড়ে নড়ছে না—নড়বে কোথায়?

গ্রহের ফের একেই বলে। সারাদিনের খাটুনির পর ষ্টেশনের এই প্রতীক্ষা অসহ্য। তবু সহ্য না করে উপায় কি।

ক্লান্ত দেহটার ভার যেন আর ধরে রাখতে পারছিল না পা দু'টো। টলতে টলতে ঝিমুতে-ঝিমুতে ওর মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইতে হলো তবু।

স্থানে-স্থানে যাত্রীদের জটলা চলছে ভীড়ের মধ্য থেকে। টুকরো-টুকরো বাক্যালাপগুলি কানেও আসছে ওর।

—আজ তার কাটা, কাল কারেণ্ট ফেল্—কী লাভ হলো মশাই ইলেকট্রিক্ ট্রেন্ হয়ে?

—কয়লার ইঞ্জিন ছিলো, বেশ ছিলো—কেন বাবা ইলেকট্রিক করা কেন?

—ট্রেন আসতে লেট্ করছে—তা সাইডিং থেকে একটা গাড়ি দিয়ে দিলেই তো হয়?

—এই জন্যই তো ব্যাটারা প্যাঁদানী খায় মশাই—ওদের প্যাঁদানোই উচিৎ; ষ্টাফ্গুলো কাজ করে কেউ যে গাড়ি ঠিক-ঠিক চলবে?

মন্তব্যগুলো শুনেই যাচ্ছে প্রিয়তোষ। কিছু বলবার মত মনের অবস্থা তার নেই।

সে ভাবছে—কতদিন—আর কতদিন? নানা সমস্যা জর্জরিত আজ আমাদের দেশ। মুক্তি কতদিনে আসবে এ অবস্থা থেকে? অর্থ সমস্যা, বেকার সমস্যা, দলগত সরকারী গদি দখল করে নিজ-নিজ দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির মাঝে রাজনৈতিক সমাধান কোথায়?

অথচ, এ সমাধান না হলে গনতান্ত্রিক সমাধান নেই। আর তা' না থাকলে জনগনের মঙ্গল নেই—নেই দেশের উন্নতি বা ভবিষ্যত।

ভাবতে গিয়েই মনে হলো, না এ চিন্তা তার জন্য নয়। স্বাধীন দেশের নাগরিক হলেও, দেশের প্রতি তার কর্তব্য থাকলেও এ সব চিন্তা করার জন্য তো নেতারা রয়েছেন—সরকার রয়েছেন। প্রতিটি মানুষই যদি রাজনীতি নিয়ে ভাবে তা'হলে সমাজ নীতি আসবে কোত্থেকে? আর, তা' না এলে মানুষের শান্তি কোথায়?

চিরকাল রাজনীতি থেকে বাইরে থাকলেও, আজ এই মুহূর্তে একটু রাজনীতি করবার ইচ্ছে হলো ওর।

এ সময় হঠাৎ মাইকে ট্রেনের আগমন বার্তা ঘোষিত হওয়ায় ভাবনা ছেড়ে ট্রেন ওঠবার চিন্তায় মন দিলো সে।

ন'টা চল্লিশের পরের ট্রেন্ ছাড়বার সময় অতিক্রান্ত হয়েও দু'মিনিট বেশি হয়ে গেছে। না, উঠতেই হবে যা হোক করে। মনে হচ্ছে দশটার মধ্যেই গাড়ি ছাড়বে। তা'হলে সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছনোও যাবে। কী করে এখন ওঠা হবে সেই বুদ্ধি চাই এবার।

ঠেলাঠেলি করে একটু সামনের দিকে এগোতে চেষ্টা করলো প্রিয়তোষ। না, উপায় নেই এগুবার। ওর সামনে বিরাট ভীড়। ওদের আগে উঠতেই দিতে হবে।

ক' মিনিটের মধ্যেই গাড়ি এসে গেল। ভর্তি। আরোহীগন নামবেন। যাত্রীরা উঠবেন। কে আগে সে নিয়ম এখন নেই। গায়ের জোরে যে যা পারে করে নিক—কেউ বাধা দেবে না এখন। দিলেও শুনছে কে?

ফলে খণ্ড যুদ্ধ বেঁধে গেল যেন একটা। কারো হাত ভাঙলো, কারো চটি ছিঁড়লো, কারো বা গেল জামা—গেলো-গেলো কার কি?

ভীড় থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়ালো প্রিয়তোষ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধাক্কা-ধাক্কি কমে এলো অনেকটা। যে যার মত উঠে গেছে, নেমে গেছে—বসতে পেরেছে যারা বসে গেছে—দাঁড়াবার যারা দাঁড়িয়ে গেছে নিজ-নিজ সুবিধা মত। না, স্থান নেই আর।

তবু, ছাড়বার উপায় নেই আর এ ট্রেন। হ্যাঁ, প্রিয়তোষও উঠলো—ওর মধ্যে একধারে দাঁড়াবার মত ঠাঁইও করে নিলো একটু। চাপা-চাপি, ঠেলা-ঠেলির মধ্যেও সে ভেবে চলল নিজেকে। বালিগঞ্জের ট্যুইশনিটা নিয়ে নিলে এ পরিশ্রমের লাঘব হবে হয়তো একটু।

হ্যাঁ, নিয়েই নেবে সে ওই চাকরিটা। খাওয়া-থাকার একটা নিশ্চিন্ত সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না।

তাছাড়া, এই ভীড় ঠেলাঠেলি, হাত পুড়িয়ে রান্না খাওয়া এ সব করতে গেলে মনের ইচ্ছা পুরণ হবার সম্ভাবনা কম। সুযোগ যখন এসেছে তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। কিন্তু—

ভাবতে গিয়েই হঠাৎ মনে হলো তার, কিন্তু এ সব যে ভাবছে সে এর বিপরীতটা যদি হয়? যদি ওই খাওয়া থাকার নিশ্চিন্ততা খুঁজতে গিয়ে নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে হারাতে হয় তাকে? যদি লেখার সুযোগ না আসে তার?

সামান্য কিছু টাকা মাইনে দিলে যে যুগে গণ্ডা-গণ্ডা গৃহশিক্ষক পাওয়া যায়, যে যুগে এতগুলো টাকার বিনিময়ে লোক রাখতে যাচ্ছেন যাঁরা তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের স্বার্থের জন্য রাখছেন। ওর খেয়াল-খুশি মত চলা, ইচ্ছে মতো আহার-বিহার, স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও আদর্শ জীবন যাপনে নিশ্চয় অন্তরায় হবেন তাঁরা।

না, ও ট্যুইশানি নেওয়া চলবে না ওর। পরের গোলাম হয়ে, পরের কাছে আত্ম বিক্রয় করে আখের গুছিয়ে নেওয়া হয়তো যায় কিন্তু জীবনে উন্নতি সাধন কিম্বা মনের অভিলাষ পূরণে সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

ট্রেন চলছিল ততক্ষণে। অনেক লেট্ হলেও গাড়ীটা ভালোই

চলছিল। আধঘণ্টার মধ্যেই সোনারপুর পৌঁছালো প্রিয়তোষ। পাড়াটা নীরব হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

এদিকটা এমনিতেই গ্রাম গ্রাম ভাব তায় রাত হয়েছে। বাড়িটা দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে—অন্ধকার। সব ঘরের আলো নিভে গেছে।

সদর দিয়ে প্রবেশ করার মুখে পথের উপরের দেশি মদের দোকানটি কিন্তু বন্ধ হয়নি। একটি মাত্র ছোট কেরোসিনের বাতি জ্বেলে বেচা-কেনা ঠিকই চলেছে। বিশ-পঁচিশ জন খরিদ্দার প্রায়ান্ধকারের মধ্যেই বসে মদ্যপান করছে নীরবে।

ওদের অতিক্রম করেই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। একটু থমকে দাঁড়ালো প্রিয়তোষ। এত রাত্রে কোনদিন ফেরেনি সে। অন্যদিন যত দেরি হোক রাত দশটার মধ্যে ফিরেছে।

আজ এগারোটা বেজে গেছে। যদি ওই মাতালগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর উপর। কথায় বলে, দাঁতাল আর মাতাল—এদের বিশ্বাস করতে নেই। প্রমাদ গুনলো সে।

মাতালদের নজর পড়লো ওর দিকে। একজনের হয়তো নেশাটা তখনও জমে উঠেনি।

সে বলল, এই, রাস্তা ছেড়ে বস্‌না সব—বাবুকে যেতে দে।

ক'জন পথ ছেড়ে সরে গেল একধারে। প্রিয়তোষ বাড়ির মধ্যে ঢুকলো এবার। চাবি ঘুরিয়ে দরজার তালা খুলে ঘরের আলোও জ্বাললো।

বাড়িউলির সাড়া পাওয়া গেল এ সময়, কে, ছেলে এলে নাকি?

—হুঁ!

—এত রাত হলো যে!

—গাড়ি লেট্ ছিল।

—রান্না আছে, না রাঁধবে?

—আছে।

জামা খুলতে খুলতে জবাব দেয় প্রিয়তোষ। যদিও মেজাজটা এখন মোটেই ভাল না; শরীরটা ক্লান্ত। তবুও, বাড়িউলির এ আত্মীয়তার সুরটা মন্দ লাগে না। আপন বলতে আজ আর কেউ নেই ওর। বাড়ির সংগে সম্পর্কটা তো ছিন্নই হয়ে গেছে বলতে গেলে।

না, আর ওদের সংগে মিলন ওর হবে না। এবার বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে প্রতিজ্ঞাই করে বেরিয়েছে প্রিয়তোষ আর না ফেরাব ব্যাপারে। ইতিপূর্বে অনেকবারইতো বেরিয়েছিল। আবার ফিরেওছিল। পারলো কই থাকতে? না, সংসারিক তুচ্ছ সুখ দুঃখকে জয় করতেই হবে। সংসার ওর জন্যে নয়।

ওকে একলাই চলতে হবে ওর পথে—সে পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হয় হোক।

নির্দিষ্ট দিনে বালিগঞ্জ গেল না প্রিয়তোষ।

মন তার আগেই স্থির হয়ে গেছে। বড়লোকের বাড়ির পোষা কুকুর হওয়ায় চেয়ে অনশনে অর্ধাসনে থাকা ঢের ভালো।

হ্যাঁ, প্রস্তুত সে—দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব-অনটন যত আসে আসুক সে হার মানবে না জীবনের কাছে। জীবনে দাঁড়াবেই সে, দাঁড়াবে।

ওর পক্ষে এ রকম আদর্শবাদী হবার একটা কারণও ছিল। সময়টা ছিল জানুয়ারী মাস।

এ সময়ে কলেজস্ট্রীটের বইয়ের পাড়ায় কাজ থাকে মোটামুটি। সারাদিন এবং অর্ধরাত্রি অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার আঠার-উনিশ ঘণ্টা খেটে মোটামুটি তার আয় বাড়লো।

খেয়ে পরে দু'পাঁচ টাকা হাতে জমলো সপ্তাহের মধ্যে। চাল-ডাল-তেল-নুন-ঝাল ইত্যাদি কিছু রসদ মজুত করলো সে দু'এক সপ্তাহের মত। এবং এক বন্ধুর পরামর্শে দশ টাকা দিয়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে একটা এ্যাকউন্টও খুলে ফেলল।

আজকাল সময় খুব কম। রবিবারও ফুরসত নেই। অধীরের অফিসে তাই বড় একটা যায় না এখন প্রিয়তোষ। পথে-ঘাটে বা হাটে-বাজারে এখন দেখা হলে অভিযোগ করে অধীর, কী-খবর আজকাল আর যাও না কেন অফিসে?

—সময় পাচ্ছি না।

—কাজকর্ম হচ্ছে বুঝি খুব?

—এই মোটামুটি চলছে।

—ভালো, ভালো। আগে কাজ তারপর সব। তা' বাড়িতে এসো একদিন।

—যাবো। আমি একা মানুষ—তায় রাঁধা-বাড়া, হাট-বাজার কাজকর্ম। তুমি তো আসতে পারো মাঝে-মধ্যে। দু'বেলাতো ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করো—ঢুকে পড়লেই পারো ?

—হ্যাঁ যাবো একদিন। মানে, সময় পাচ্ছি না—বোঝইতো—সংসারী মানুষ।

কথা বাড়ালো না প্রিয়তোষ। সে জানে অধীর বাসাটা তাকে ঠিক করে দিলেও, এ বাড়িতে সে আসবে না। কারণ, এ বাড়ির পরিবেশ ভালো না। ওরা ভদ্রলোক, ওদের সমাজ বা মেলামেশার স্থান আলাদা। কয়েকদিন আগেই অধীরের কথা থেকে প্রকাশ পেয়েছে তা'।

কিন্তু ভেবে পায় না প্রিয়তোষ আজকালকার একটি শিক্ষিত লোক বিশেষ করে যে শিল্পী, তার মনে এমনি একটি চিন্তা স্থান পায় কেমন করে ? তা'ছাড়া, সেই তো প্রিয়তোষকে এনেছিল এখানে। যেখানে সে নিজে যেতে পারে না বন্ধু হয়ে বন্ধুকে সেখানে আনতে পারলো কেমন কোরে অধীর ?

না, ওর সংস্পর্শ এবার থেকে এড়িয়ে চলবে প্রিয়তোষ।

ভাবলো বটে কিন্তু পরের দিন ওর কাছে না গিয়ে পারলো না আবার।

দিনটি রবিবার। সকালে উঠে চা খেয়েই প্রুফ দেখতে বসেছিল সে। বিকেলটা যাতে হাতে কাজ না থাকে সে জন্যে দুপুরে খাবার আগেই কাজগুলো সেরে নেবে ভেবেছিলো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রান্নার কথা মনে পড়ায় সে সংকল্পে বাধা পড়লো। খেতে হবে তো—অথচ রান্নাও করতে ইচ্ছে করছিলো না। কী করা যায় ?

উঠোনের ওধারের সারির ঘরের উৎকলবাসী পিওন লোকটি এ সময় একবার হঠাৎ ওর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো কেন যেন। বলল, রান্না হই গেছে ?

অকূলে কূল পেলো যেন প্রিয়তোষ। বলল, আপনার রান্না চলছে ?

—হ্যাঁ, ভাত হউচি।

—আমাকে দু'টো ভাত দেবেন?

—কেন দিবো না, নিশ্চয় দিবো। আপুনি খাইবেন আমর রান্না

—খাবো। তা'হলে দু'টো চাল দিয়েদি'?

—না-না, চাউর দিতে হবো না।

—তা'হলে খাবো না।

—কেন, আমি দুটো চাউর বেশি নিতে পারবো না?

—তা হোক।

প্রিয়তোষ উঠে একটি থালায় করে কিছু চাল ও গোটা কয়েক আলু দিয়ে দিল লোকটিকে। সে চলে গেল।

ও বসলো আবার প্রুফ্ দেখতে। যাক, নিশ্চিন্ত। রাঁধার ঝামেলা আজ আর করতে হবে না।

যথাসময়ে ভাত দিয়ে গেল উৎকলবাসী। শুধু ভাত নয়। সংগে শাক-ভাজা-ভুজি চচ্চড়ি ইত্যাদি পাঁচ-ছ'রকম তরকারী ও মাছের ঝোল। স্নান করে এসে পরম তৃপ্তি সহকারে খেলো প্রিয়তোষ। বাড়ি ছাড়ার পর এ ক'দিনের মধ্যে এত রকম আর এত ভালো রান্না খাওয়া জোটেনি তার ভাগ্যে।

খাওয়ার পর একটু ঘুমোলো। কিন্তু দিবানিদ্রার অভ্যাস না থাকায় বেশিক্ষণ ঘুম হলো না। সাড়ে তিনটে নাগাদ উঠে পড়লো। কী করা যায়—কিছু ভাল লাগছে না। ঘরে থাকতেও ইচ্ছে করছে না এখন।

চা করলো প্রিয়তোষ। তারপর একসময় ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে 'পড়লো। কোথায় যাওয়া যায়? একবার ভাবলো অধীরের ওখানে গেলে কেমন হয়?

না, এখন ইচ্ছে করছে না ওর ওখানে যেতে। অধীর হয়তো এখন

ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া, সে ওর কাছে না আসায় প্রিয়তোষও ঠিক করেছে ওর ওখানে আর যাবে না। ওর থেকে লাটুবাবুর বাড়ি গেলে কেমন হয়?

লাটুবাবুর বাড়ি গোটা কয়েক বাড়ির পরই। ভদ্রলোক কবি। প্রিয়তোষের অনুরাগী এবং ভক্তও বটে। ওর লেখা পড়েছেন দু'একটা হয়তো সে কারণে একটু সমীহ করে চলেন তিনি প্রিয়তোষকে।

বহুদিন তাঁর বাড়ি যাবার জন্য অনুরোধও করেছেন লাটুবাবু প্রিয়তোষকে। যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সময় হয়নি। তাছাড়া, প্রিয়তোষের সময় হলেও লাটুবাবুর সময় হয় না সব সময় বাড়ি থাকবার মত। তিনি ব্যবসায়ী।

কবি লাটুবাবুর পুরোনাম পরিমল সাধুর্খা। এখানকার ছেলে হলেও ওই নামে তাঁকে বড় একটা কেউ চেনে না।

এখানের সকলের কাছেই তিনি লাটু বা লাটুবাবু। বেঁটে-খাটো গোল-গাল চেহারা। চওড়া কালো পেড়ে ধুতি ও পাঞ্জাবী পরেন সব সময়। মুখে বসন্তের দাগ।

মানুষটি বেশ। ফূর্তিবাজ আমুদে ও সদা হাস্যময়। দোকানদারির মাঝে মাঝে কাব্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই। ফলে বন্ধুর সংখ্যা তাঁর অনেক। ভক্তও সীমিত নয়।

প্রায় সব সময়ই দোকানে আড্ডা তাঁর চলছেই। কেউ না কেউ আছেই বসে দোকানে। চা সিগারেট তেলেভাজা বিতরণে কার্পণ্য নেই লাটুবাবুর। অতএব, বন্ধুর অভাব তার হবার কথা নয়।

অধীরের মাধ্যমেই ওর সংগে আলাপ প্রিয়তোষের। খুব বেশি একটা ওর দোকানে যায় না সে। আড্ডা মারতে যে ভাল লাগে না তা' নয়। ঠিক হাটের মধ্যে বসে আড্ডা জমাতে সে পারে না বলেই যায় না ওখানে।

তবু বাজারে গেলেই দেখা হয়। লাটুবাবু ডাকেন, এই যে দাদা, আসুন না একটু। এদিকে আসতে নেই একবার?

সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় প্রিয়তোষ, হ্যাঁ-হ্যাঁ আসবো—এখন নয়!

—একটু চা' খেয়ে যান!

—খাবো এসে একদিন—আজ নয়।

একটু ইতিহাস আছে লাটুবাবুর—

এ অঞ্চলের বনিয়াদী পরিবার ওঁরা। ও পাড়ায় নিজবাড়ি। ক' পুরুষ থেকেই বাস। বাবা আছেন। ভাই, বোন, ইত্যাদি কেউ নেই আর লাটুবাবুর। পিতা-মাতার এক মাত্র সন্তান তিনি। মা গত হয়েছেন কয়েক বছর।

তবু বাড়ি থাকেন না লাটুবাবু। প্রিয়তোষের পাড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করেন। স্ত্রী, পুত্রকন্যা নিয়ে চারজনের সংসার তাঁর। এ ছাড়া আছেন ওঁর সমবয়েসী এক বিধবা মহিলা। লাটুবাবু তাঁকে 'মা' বলে ডাকেন।

ভেবে পায় না প্রিয়তোষ লাটুবাবুর এই মা তাঁর কেমন মা? বয়েসের দিক দিয়ে ওঁরা দুজনেই সমবয়েসী। তা'ছাড়া, লাটুবাবুর পিতা বেঁচে থাকতেও এই মা'টি বিধবা কেন এবং স্বামীর সংগে না থেকে পুত্রের সংগে থাকেন কেন তিনি, কে জানে?

নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার।

বিশেষ কিছু চিন্তাকে মনে স্থান দেয়নি প্রিয়তোষ এ সম্বন্ধে। লাটুবাবুর ব্যক্তিগত জীবনে কোন গোলমেলে কিছু থাকলেও থাকতে পারে—মানুষ হিসেবে কিন্তু তিনি মোটেই গোলমেলে নন।

প্রিয়তোষ এলো এখন লাটুবাবুর বাড়ি। মনে ইচ্ছে খানিকটা সময় কাটানো।

বাড়িতে প্রবেশের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলো তাই, —লাটুবাবু—লাটুবাবু আছেন নাকি ?

—কে ?

লাটুবাবুর মা বেরিয়ে এলেন। প্রিয়তোষকে চেনেন তিনি।

বললেন, আসুন—ভিতরে আসুন !

তবু ভিতরে গেল না প্রিয়তোষ। প্রশ্ন করলো, লাটুবাবু কই ? —আছেন ?

—বাড়িতে নেই তো !

—কোথায় গেলেন ?

—কী জানি, কোথায় যেন বেরোলো একটু।

—দোকানে যাননি তো ?

—না, দোকান তো আজ বন্ধ। তা' আসুন, ভিতবে আসুন।

—পরে আসবো একদিন।

প্রিয়তোষ নেমে এলো পথে। লাটুবাবুকে না পেয়ে মেজাজটা বিগড়ে গেলো একটু। কোথায় যাওয়া যায়—ঘরে ফিরতে ভালো লাগছে না এখন। আড্ডা মারতে ইচ্ছে করছে এখন।

জমজমাট নির্ভেজাল নিটোল একটি আড্ডার প্রয়োজন এখুনি। অনেকদিন এমনি একটি আড্ডার স্বাদ পায়নি প্রিয়তোষ। না, অভিমান করে লাভ নেই। '

অধীরের বাড়ি এলো প্রিয়তোষ। যথারীতি ডাকলো বাইরে থেকে, অধীর—

—এসো, এসো !

ঘরে প্রবেশ করলো প্রিয়তোষ। তক্তপোষের উপরে খাতা-পত্র ছড়িয়ে পাণ্ডুলিপি ঘাটা-ঘাটি করছিল অধীর। পাশেই আধশোয়া অবস্থায় লাটুবাবু খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছেন। এ ছাড়া রয়েছে অমর। ওদের ঢাকুরিয়ার বন্ধু। তিনিও কবি।

কবি অমর প্রিয়তোষদের চেয়ে বয়সে কিছু ছোটই হবে। শান্ত, ভদ্র ও স্বল্পভাষী। সংসারে মা আর সে। ঢাকুরিয়ায় আছে

কয়েক বছর দু'কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। মোটা-মুটি সচ্ছল অবস্থা। কারণ, চাকরিটি ভালই করে অমর। কোন তেল কোম্পানীর অফিসার সে।

অধীর, লাটুবাবু ও অমর একসংগে তিনজনকে পেয়ে খুশি হলো প্রিয়তোষ। তক্তাপোষের একধারে বসে বলল, আরে অমর যে, কখন এলে ?

—এইতো একটু আগে। আপনার বাড়িতেই আসবো ভাবছি ক'দিন থেকে। কিন্তু আপনার বাড়িটা তো চিনি না। তাই অধীরদার কাছে এলাম—ওঁকে নিয়ে আপনার বাড়ি যাবো ভাবছিলাম।

—তা' চলো। তারপর লাটুবাবু, আপনি এখানে! এদিকে আমি আপনাকে খুঁজে-খুঁজে সারা।

বিনয়ে গলে গেলেন লাটুবাবু—কী বলছেন দাদা, আমাদের মতো অভাজনদের আবার খুঁজতে হয় নাকি—আমরা হচ্ছি আপনাদের দাসানুদাস। আদেশ করলেই গিয়ে হাজির হতে পারি। কিন্তু খোঁজ করছিলেন কেন ?

—এমনি। ভালো লাগছিলো না, ভাবলাম যাই একবার লাটুবাবুর বাড়ি। তা গেলামও—কিন্তু গিয়ে শুনলাম আপনি বেরিয়েছেন।

—আমার দুর্ভাগ্য। গেলেনই যদি বলে যাবেন তো আগে ? তা' চলুন যাই—

—আজকে নয়, আর একদিন যাওয়া যাবে—ওর থেকে চলুন আমার ঘরে। জাঁকিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

অমর বলল, সেই ভালো—প্রিয়তোষদা'র বাড়িটাও দেখা হবে আমাদের।

অধীর বলল, কিন্তু এখন একটু চা যে দরকার।

—তা' আমি আগেই জানি। এই নাও। বলতে বলতেই একটি থালার উপরে গোটা চারেক কাপ সাজিয়ে ঘরে প্রবেশ করল অধীরের সহধর্মিণী।

ওরা সকলে চা পান করলো। তারপর উঠে সদলবলে এলো প্রিয়তোষের ঘরে।

অমর বলল, তারপর প্রিয়তোষদা, কী লিখছেন-টিখছেন আজকাল?

—লেখা: লেখা আর হচ্ছে কই আজকাল? প্রিয়তোষ বলল বেশ খানিকটা নরম সুরে।

লাটুবাবু বললেন, ও সব শুনছি না: আজ কিন্তু যা হোক একটা লেখা পড়ে শোনাতে হবে আপনার।

অধীর সায় দিলো ওকে, নিশ্চয়—নিশ্চয়!

অগত্যা পুরোনো একটা লেখা বার কবতে হলো। পড়ে শোনালো প্রিয়তোষ।

লাটুবাবুর আগ্রহই বেশি। বললেন, আর একটা। পরপর কয়েকটি লেখা শোনালো প্রিয়তোষ। কিছুক্ষণ কাটলো এরপর হাসি-ঠাট্টা ও হালকা আলোচনায়।

তারপর চা বসালো প্রিয়তোষ। ঘরে চিড়ে-মুড়ি-বিস্কুট ইত্যাদি ছিল। তাই দিয়ে আপ্যায়নও করলো সবাইকে।

অমর বলল, আপনাকে কষ্ট দিলাম অনেক প্রিয়তোষ দা'?

—কেন?

—এত সব ঝামেলা করলাম আমরা এসে।

—না-না ঝামেলার কি: একে আমি কষ্ট মনে করি না। বরং কেউ আসে না বলে ভাল লাগে না।

লাটুবাবু মাঝখান্ থেকে বলে উঠলেন, আসবো এবার থেকে: রোজ-রোজ এলে এমনি খাওয়াবেন তো?

—খাওয়াবো: অবশ্য যদি জোটাতে নিতান্তই অক্ষম হই তা'হলে স্বতন্ত্র কথা।

—শুধু এই সব জোটালেই চলবে না। সেই সংগে আমাদের জন্য একটি বৌদি-টৌদিও জোটান।

অধীর একধারে আধশোয়া অবস্থায় একটি ম্যাগাজিন্ ঘাঁটছিল।

বলে উঠলো হঠাৎ, ঠিক-ঠিক! আমি তো বলেই দিয়েছি : পাঁচ বছর সময় দিলাম তোমাকে, এর মধ্যে একটা বিয়ে করতে হবে।

—পাঁচ বছর! না, অতদিন সবুর করতে পারবো না আমরা : আমাদের এ বছরের মধ্যেই একটি বৌদি চাই। বললেন লাটুবাবু।

এমন সময় রসভঙ্গ হলো হঠাৎ। আর তা' করলো বাড়িউলি স্বয়ং। দরজার সামনে উদয় হয়ে জানালো, ছেলেকে যেন কে ডাকছে।

—কে?

—কি জানি, ওই বাইরে দাঁইড়ে আছে।

প্রিয়তোষ বেরোল। সত্যিই একটি লোক দাঁড়িয়েছিল বাড়ির মধ্যে প্রবেশের মুখে?

—কাকে চাই?

—প্রিয়তোষ বাবুকে একটু-চাই।

—কেন?

—আমি সিনেমা হল থেকে এসেছি। একটা চিঠি আছে। বলেই লোকটি জামার পকেট থেকে একটি ছোট্ট চিরকূট বার করে ওর হাতে দিল।

পড়ে দেখল প্রিয়তোষ : লিখেছেন অনিলবাবু। '...মাষ্টার-মশাই, অবশ্যই একবার সিনেমা হলে বা বালিগঞ্জে গিয়ে ছোট বাবুর সংগে দেখা করবেন। আপনার কথা ওঁদের আমিই বলেছি। আমি ওঁদের চাকরি করি। আমার মুখ রক্ষা যাতে হয় পারলে তাই করবেন।'

চিঠি পড়ে অবাক হলো প্রিয়তোষ। তার বাড়ির ঠিকানা অনিলবাবু পেলেন কোত্থেকে?

বলল, আমি যে এখানে থাকি তা উনি জানলেন কী করে?

লোকটি বলল, কাল থেকে খুঁজছি। আমার বাড়ি এখানেই। অনেক লোককে জিজ্ঞেস করে-করে আপনাকে খুঁজে বার করেছি।

মুহূর্তকাল কী যেন ভাবল প্রিয়তোষ। তারপর আবার বলল, আচ্ছা তুমি যাও, আমি যাচ্ছি একটু পরে।

ততক্ষণে অধীর, অমর, লাটুবাবু ওরা সকলেই এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওর পাশে।

লাটুবাবু বললেন, কী ব্যাপার?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রিয়তোষ বলল অধীরকে, কী করি অধীর—বালিগঞ্জের সেই টিউশানির জন্য ওরা ডেকে পাঠিয়েছেন—যাবো?

—সে আমি কী করে বলবো। তবে আমার মনে হয়, ওসব তোমার পোষাবে না।

অধীর চলে গেল। লাটুবাবুও গেলেন। অমর তখনও আছে।

প্রিয়তোষ ওকে বলল, চলো আমরা একসংগে বেরোই? সিনেমা হল ঘুরে ষ্টেশনে। ফিরে এসে তোমাকে ট্রেণে তুলে দেবো। যাবার তাড়া নেই তো?

—না, না।

দু'জনে বেরোলো ওরা। সোনারপুরের সিনেমা হলে এলো। কিন্তু এসেই শুনলো ছোটবাবু একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন।

অনিলবাবুর সংগে দেখা হলো। তিনি বললেন, যান্‌না, বালিগঞ্জে একটু ঘুরেই আসুন না!

—আমি গিয়ে আবার কী করবো? যা বলবার আপনাকেই বলে দিচ্ছি!

—না, না আপনি তবু যান: বুঝতেই তো পারছেন আমি এঁদের চাকরি করি!

প্রিয়তোষ স্থির করেছে আজকের মিটিয়েই ফেলবে ব্যাপারটা। তাই ষ্টেশনে এসে অমরকে বলল, চলো দু'জনেই যাই বালিগঞ্জে।

—আমি আবার যাবো কী করতে !

—আরে, চলো, চলো ! তুমি সংগে থাকলে আমি একটু সাহস পাবো। ও টিউশনিটা নেবো না আমি। তুমি সংগে থাকলে স্পষ্ট না বলতে সুবিধে হবে আমার—একা গেলে যদি না বলতে না পারি।

হু'জনে প্লাটফরমে এলো ওরা। একটু পরেই ট্রেন ছিল। সেই ট্রেনেই এসে নামলো বালিগঞ্জে।

আজ আর নীচতলায় কাউকে খোঁজ করল না প্রিয়তোষ। অমরকে নিয়ে সোজা তিনতলায় চলে এলো। সন্ধ্যে হয়ে গেছে এতক্ষণে। বাচ্চারা পড়তে বসেছিল। ওরা আসতেই উঠে গেল সব।

খবর পেয়ে ছোটবাবু এলেন। সঙ্গে ছোটগিন্নী। পাশের ঘরেই ছিলেন তাঁরা।

ছোটবাবু বললেন, আরে, মাষ্টারমশাই যে ঃ কী ব্যাপার, সেদিন এলেন না তো !

বাচ্চারা যারা পড়তে বসেছিল তারাও ফিরে এসেছে তাদের বাবা-মায়ের সংগে। ওদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো।

তুই মেয়ে এক ছেলে ছোটকর্তার। ছেলেটি বড়।

প্রিয়তোষ ওর হাত ধরে কাছে টেনে জিজ্ঞেস্ করলো, কী নাম যেন তোমার ?

—খোকা।

—বাঃ বাঃ—ভালো নাম ?

—দীপক।

ছোটবাবু আবার প্রশ্ন করলেন এ সময়, কী মাষ্টারমশাই, আপনি এলেন না যে ওদিন ?

এতক্ষণে মনকে শক্ত করে নিয়েছিল প্রিয়তোষ।

বলল, ইচ্ছে করেই আসিনি। মানে, ভেবে দেখলাম টিউশানি করা আমার পোষাবে না।

—কেন ?

—আমাকে কলেজষ্ট্রীটে কাজ করতেই হবে।

—তা করুন না—এদিকে পড়ানও সেই সংগে।

—কিন্তু—

—কোন কিন্তু আমরা শুনবো না মাষ্টারমশাই, আপনাকে আসতেই হবে—আমরা আপনার আশায়ই রয়েছি। ছোটগিন্নী বললেন মৃদুহাসি হেসে।

একজন ভৃত্যগোছের লোক জল খাবার নিয়ে এলো এ সময়। দু'বাটি মিষ্টান্ন ও কিছু রসগোল্লা। দু'ভাগে দু'জনের পাশে রেখে চলে গেল। ছোটগিন্নী ওকে দু'গ্লাস জলেব হুকুম করে বললেন, খান মাষ্টার মশাই!

—এ সব আবার কেন ?

—এ সামান্য।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার জন্য প্রিয়তোষ অমরকে বলল, নাও খেয়ে নাও—রাত হয়ে যাচ্ছে।

অমর অমনি মিষ্টান্নের বাটি হাতে তুলে নিয়ে খেতে খেতে বলল, আপনি তা'হলে কবে আসছেন প্রিয়তোষদা ?

ছোটকর্তা জবাব দিলেন ওর হয়ে, কবে আবার কি, মাষ্টার মশাই কাল সকাল থেকেই আসবেন।

—হ্যাঁ, দেরি করে আর কি লাভ! অমর বলল।

রাতে ভালো ঘুম হলো না। অনেক রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে ভাবলো প্রিয়তোষ নিজেকে। এবার না গেলে নয়, ওদের এক রকম কথাই দিয়ে এসেছে সে। এদিকে এই ঘর সংসার। এটাও নষ্ট করা যাবে না। কী করা যায়—তবে কি এটাই তার সুযোগ? কে জানে।

ঠিক ছ'টায় বেরিয়ে পড়লো প্রিয়তোষ। দশ মিনিটের মধ্যেই ট্রেন ছিল। সেই গাড়ি ধরে বালিগঞ্জ এসে নামলো একুশ বাইশে। না, গাড়িটা ঠিক টাইমেই এসেছে আজ। অতএব সাড়ে ছ'টার মধ্যেই পৌঁছনো গেল তের নম্বর ষ্টেশন রোডে।

লাল রঙের চারতলা প্রাসাদ। এ অঞ্চলে লাল বাড়ি নামে পরিচিত এ সৌধ। সামনে বড় লোহার গেট্। ওটা খোলাই ছিল।

সোজা ভিতরে ঢুকে একতলা দোতলা পেরিয়ে তিনতলায় উঠে এলো প্রিয়তোষ। না, ঘুম ছাড়েনি এ বাড়ির অঙ্গ থেকে এখনও।

শীতের সকাল। সময়টা অগ্রহায়নের মাঝামাঝি। একটু বেশিই শীত পড়েছিল গত রাত্রে। হয়তো সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন সেজন্য।

পুব পশ্চিমে লম্বা করিডোরের ছ'পাশে সারি সারি কক্ষ। ডাইনে-বাঁয়ে মোট আটখানি ঘর প্রতি তলায়। ডানদিকের শেষের ঘরটিতেই ইতিপূর্বে যে কয়বার এসেছিল বসেছিল। ওই ঘরটিই তার চেনা।

অতএব, ওঘরের দুয়ারের কড়াই নাড়লো। ছ'এক মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর একসময় দরজা খুলে গেল।

ওকে দেখেই ছোটগিন্নী মাথায় কাপড় তুলে দিলেন প্রথমে। তারপর ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললেন, ও মাষ্টারমশায়—একটু দাঁড়ান!

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

দাঁড়িয়ে রইলো প্রিয়তোষ। ছোটগিন্নী ভিতরে গেলেন। ছেলেমেয়েদের ডাকলেন, এই খোকা, এই বুড়ি ওঠ্—মাষ্টারমশায় এসেছেন যে!

কিন্তু খোকা বা বুড়ির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এত সকালে হয়তো ওঠা অভ্যেস্ নেই ওদের। না, বড় তাড়াতাড়ি এসে গেছে সে—কাল থেকে পরের ট্রেনেই আসতে হবে।

একটু পরে ছোটগিন্নী বেরিয়ে এলেন আবার। তাঁর হাতে এক গোছা চাবি। নির্দিষ্ট চাবিটি ঘুরিয়ে করিডোরের এ পারের সারির দ্বিতীয় ঘরটি খুলে এ ঘর আর পাশের ঘরের মধ্যেকার বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলেন, রামমোহন—এই রামমোহন—

—উঃ—

—ওঠ।

রামমোহন উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে দরজা খুলে দিল।

ছোটগিন্নী সে ঘরে প্রবেশ করে বললেন, মাষ্টারমশায় এসেছেন। তারপর ওখান থেকেই প্রিয়তোষকে উদ্দেশ্য করে পুনরায় বললেন, মাষ্টারমশায়, এ ঘরে আসুন।

—আসছি!

প্রিয়তোষ সংগে-সংগেই ও ঘরে প্রবেশ করলো। ঘরটি বড়। ঝক্‌-ঝকে দেয়াল। চকচকে মেঝে—মোজেইক টালি বসানো।

বড় লোকের বাড়ি। তবু আসবাবপত্র নেই বড় একটা এ ঘরে। একধারে বড় একটি তক্তাপোষ পাতা। তার পাশে একটি চেয়ার। আর একপাশে জানালার ধারে একটি মিটসেফ।

আর কোন আসবাব নেই এ ঘরে। মিটসেফটির নীচে অনেকগুলি এঁটো বাসন ছড়ানো দেখে বোঝা যায় ঘরটি এদের

খাবার আর ভৃত্য রামমোহনের শোবার ঘর রূপে ব্যবহৃত হয়। তক্তাপোষের উপর বিছানা পাতাই ছিল। রামমোহন ওটাকে গুটিয়ে উপর থেকে নীচে চালান করে অর্থাৎ মেঝেয় রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রিয়তোষ এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। ছোটগিন্নী এবার চেয়ারটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, মাষ্টারমশায়, বসুন।

খোকা অর্থাৎ দীপক ততক্ষণে উঠে এসে মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

প্রিয়তোষ বলল, যাও তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে বই নিয়ে এসো। এত বেলা হয় কেন উঠতে—কাল থেকে তাড়াতাড়ি উঠবে।

ছাত্রের মা জবাব দিলেন ছেলের হয়ে, কাল শুতে শুতে রাত বারোটা সাড়ে বারোটা হয়ে গিয়েছিল সবার।

—কেন ?

—আমাদের এমনিই রাত হয় একটু। ওর বাবা তার উপর আবার মাংস এনে হাজির করলেন সাড়ে ন'টা দশটার সময়। রান্না হলো, তারপর খেতে খেতে দেরি হয়ে গেল।

—এক আধদিন ওরকম হয়ই। যাক, মুখ ধুয়ে খেয়ে এসো চট্‌পট।

দীপক চলে গেল। ওর মা'ও বেরিয়ে গেলেন সংগে।

প্রিয়তোষ বসে রইলো চুপচাপ। নানা চিন্তা জট পাকিয়ে আসতে লাগলো মাথার মধ্যে। দশটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে বেরোতে পারবে তো সে। কলেজস্ট্রীট পৌঁছতেই হবে এগারোটার মধ্যে—শনিবার বিকেলের আনীত প্রুফগুলো জমা দিতে হবে যে! দেরি হলে পার্টিরা অসন্তুষ্ট হবেন। হয়তো কাজও দেবেননা আর।

বই খাতা নিয়ে দীপক যখন এ ঘরে এলো বেলা তখন সাড়ে সাতটা। ওর মা' সংগে করে এনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন ওকে তক্তাপোষের উপর। চেয়ারটা টেনে নিয়ে কাছে গিয়ে বসলো প্রিয়তোষ। বলল, দেখি রুটিনটা—

—দিচ্ছি।

বলেই, দীপক খাতা খুলে রুটিন বার করতে সচেষ্ট হলো। এ খাতা সে খাতা করে চার পাঁচটা খাতা খুঁজেও শেষ পর্যন্ত রুটিন্ বেরোলো না।

প্রিয়তোষ বলল, কী হলো, পেলে না?

—আজ্ঞে না। নতুন রুটিন দিয়েছে কয়েকদিন হলো—লিখে আনতে ভুলে গেছি।

—তা'হলে প্রত্যেক দিনের পড়া করছ কী করে?

—ও আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।

—আজ কী কী বিষয় আছে বলতে পারবে?

—হ্যাঁ। আজ বাংলা গদ্য, ইংরাজী গদ্য, অঙ্ক—

—থাক্। কী পড়বে এখন?

—যা বলবেন।

—ইংরাজী বার করো।।

দীপক ইংরাজী বই বার করলো সংগে সংগেই। একটা অংশ বার করে বলল, আপনি পড়িয়ে দেবেন মাষ্টারমশাই?

—না। তুমি নিজে পড়—যেখানে না পারবে আমি বুঝিয়ে দেবো।

—আগের মাষ্টার মশাই কিন্তু সব পড়িয়ে দিতো।

—দিতো নয় দিতেন। আর, আগের মাষ্টারমশাই কী করতেন না করতেন আমার জানবার দরকার নেই—আমি যে ভাবে বলছি সে ভাবে পড়ো। হ্যাঁ, ভালো কথা—ওরা কই—পড়তে এলো না যে?

—ওরা কারা—অঞ্জু আর অমিতা?

—হ্যাঁ।

—ওরা স্কুলে যাবে এখন।

এমন সময় স্কুলের পোষাক পরিহিতা অঞ্জু আর অমিতা বইয়ের সুটকেশ হাতে এ ঘরে প্রবেশ করলো।

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস্ করলো অঞ্জুকে, ক'টায় স্কুল তোমাদের ?

—সাতটায়।

—তা' এখনতো সাতটা পঁয়ত্রিশ, গেট্ বন্ধ হয়ে যাবে না ?

অঞ্জু জবাব দিলো না কিছু। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ রামমোহন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে ঘটনাস্থলে। বলল, চলো, চলো অনেক দেরি হয়ে গেল—

ওরা বেরিয়ে গেল।

প্রিয়তোষ ছাত্রকে পড়তে বলল এবার। কিন্তু সে একবর্ণও পড়তে পারলো না। তখন বাধ্য হয়েই ওকে বলতে হলো, নাও আমি পড়ছি—আমার সংগে সংগে পড়ো। এ ভাবেই শুরু হলো প্রথম দিনেব বিদ্যাদান ও গ্রহণের পালা।

কয়েক মিনিট পরে ছোটগিন্নী এলেন প্রাতঃরাশ নিয়ে। একহাতে বড় এক থাল। মুড়ি তার পাশে দু'মুঠো চিনি ও তিনটি বড় কলা। আর একহাতে বড় এক বাটি দুধ। তক্তাপোষের উপরে ওগুলো রেখে বললেন, জল খেয়ে নিন্ আগে—অনেক দেরি হয়ে গেল আপনার জলখাবার দিতে।

—তাতে আর কী হয়েছে! ভদ্রতার খাতিবে সৌজন্য প্রকাশ করল প্রিয়তোষ।

দীপক বলল, মা, আমায় দেবে না ?

—এসো, খেয়ে যাও।

প্রিয়তোষ বাধা দিল, না, যাবে না—এখানেই দিয়ে যান ওর খাবারটা।

ছোটগিন্নী বেরিয়ে গেলেন সংগে সংগেই। একটু পরেই ফিরে এসে সমপরিমাণ দুধ মুড়ি কলা ও চিনি এনে ছেলের সামনে রেখে দু'গ্লাস জল আনলেন। তারপর প্রিয়তোষকে বললেন, চা দিতে একটু দেরি হবে মাষ্টারমশাই—রামমোহন এসে চা দেবে।

—আচ্ছা।

রামমোহন ফিরতে ফিরতে আটটা বেজে গেল। এ ঘরে এসে জামা খুলে দেয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে কাপড়টা মালকোচা মেরে হাঁটু পর্যন্ত তুলে বেরিয়ে গেল সে।

পড়াতে পড়াতে এ বাড়ির জীবনযাত্রা লক্ষ্য করছিল প্রিয়তোষ। রামমোহন একহাতে বালতির উনোন আর ঘুঁটে কয়লা নিয়ে করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল দেখে বোঝা গেল সে উনোন ধরাতে ছাদে গেল। ঐ উনোন ধরলে চা আসবে অতএব ও বস্তুটি পেতে দেরিই হবে।

দুধ মুড়ি কলা খাবার পর মনটা চা-চা করলেও এখন পড়ানোতে মন দিল সে। পড়ায় ছাত্রের মনোযোগ খুব একটা নেই। নানা অজুহাতে সে উঠতে চেষ্টা করছিল।

তবু একবারের বেশি উঠতে দিল না ওকে প্রিয়তোষ। বুঝলো বড়লোকের একটি গরু মানুষ করার দায়িত্ব পড়েছে তার ঘাড়ে। ভবিষ্যত কী কে জানে—তবু একবার চেষ্টা করা যাক না।

প্রথম দিনেই বেশ মন দিয়ে পড়ালো মাষ্টার ছাত্রকে। ইংরাজী বাংলা, ইতিহাস, অঙ্ক ইত্যাদি পড়াতে দশটা বেজে গেল কখন। হাত ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই নড়ে উঠলো প্রিয়তোষ।

আর না, এবার স্নানে যেতে হবে। খেয়ে-দেয়ে তাড়াতাড়ি না বেরোলে ওদিকে কলেজষ্ট্রীট পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে। ছাত্রকে বলল তাই, তেল গামছা এনে দাও এখুনি—আমি স্নান করবো।

দীপক গুরুর সে আদেশ পালন না করে রামমোহনকে ডেকে তেল গামছার অর্ডার দিয়ে খেলতে চলে গেল। অগত্যা চুপ চাপ বসে থাকতেই হলো কয়েক মিনিট।

এ বাড়িতে নতুন সে। এখানকার হাল চাল কিছুই জানে না সে। কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই—ওদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে যে।

উদ্বিগ্নতার মধ্যে দরজার সামনে ঘোরাঘুরি করছিল সে। ছোটগিন্নীর কানে গিয়েছিল হয়তো কথাটা। একটি পরিষ্কার

গামছা ও এক বাটি তেল এনে এ ঘরে তক্তাপোষের উপর রেখে গেলেন তিনি।

তাড়াতাড়ি তেল মেখে বেরিয়ে এলো প্রিয়তোষ। এ বাড়ির বাথরুমটা কোনদিকে কিছুই জানেনা সে। করিডোরে রামমোহনের সংগে দেখা। রান্না নিয়ে সে ব্যস্ত।

এ বাড়ির ভৃত্য কাম পাচক ঠাকুর সে। ফুটফরমায়েস খাটা ছেলে-মেয়েদের স্কুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসা ও রান্না করা তার কাজ। বাসন মাজা ও ঘর মোছার জন্য অবশ্য ঝি' আছে একজন।

প্রিয়তোষ রামমোহনকে জিজ্ঞেস করলো, বাথরুমটা কোনদিকে?

—আসুন।

করিডোরের শেষ প্রান্তে এ সারির কক্ষগুলির পরই বাথরুম পায়খানা। তারপরেই রেলিং ঘেরা ছোট একটুকারো গোল বারান্দা। ওখানে তুটো উনুনে রান্না চলছে। এ বাড়ির রান্নাঘর একটি এবং সেটি চারতলায়।

মাষ্টারকে বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে রামমোহন রান্নার তদ্বিরে লেগে গেল। এক পাশে ঝি মসলা বাটছিল। বলল, উনি বুঝি নতুন মাষ্টার?

—হ্যাঁ।

বেশি কথা বলার সময় হয়তো রামমোহনেরও নেই এখন। কড়ার মধ্যে খুন্তি চালাতে তৎপর হয়ে উঠলো সে।

প্রিয়তোষকে দাঁড়াতে হলো একটু। বাথরুম বন্ধ ছিল ভিতর থেকে। এই তাড়াহুড়োর সময় আবার ভিতরে ঢুকলো কে? অথচ জিজ্ঞেস করতেও সাহসে কুলোল না। রামমোহনের রান্না দেখতে লাগলো সে।

এক সময় রামমোহন বলল, মাষ্টারমশাই কি রোজ এ সময় চানে যাবেন?

—হ্যাঁ।

—আজ আমার কিছু রান্না হয়নি। মা কাল বাজার করেনি মেয়েদের স্কুলে দিয়ে মাছ নিয়ে আসতে দেরি হয়ে গেল।

—হোক। তাড়াহুড়ো করতে হবে না তোমায়—যা হবে তাই দিয়ে ভাত দিও আমায়।

ঝি প্রশ্ন করলো এ সময়, মাষ্টারবাবুর ছেলে মেয়ে কটা?

—একটাও না।

—সে কি—হয়নি?

প্রিয়তোষের জবাব দেবার মতো মনের অবস্থা ছিল না তখন রামমোহনকে প্রশ্ন করলো সে এতক্ষণে, ভিতরে কে গেল—ছোটবৌদি?

—না। দিদিমণি।

—দিদিমণি কে?

—মেজবাবুর বড় মেয়ে।

প্রায় সংগে সংগেই বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো একটি তরুণী। ওকে সামনে দাঁড়ানো দেখে লজ্জা পেল বেশ বোঝা গেল মাথা নীচু করে দ্রুত বেরিয়ে গেল পাশ থেকে।

প্রিয়তোষ ঢুকলো ভিতরে।

মাথার উপরের ঝরণা খুলে দিয়ে স্নান করবার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে মেলেনি ভাগ্যে। তবু আরাম করে স্নান করা জুটলনা এখন—সময় নেই। কোনরকমে কর্মটি সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। জামা কাপড় প'রে মাথা আঁচড়ালো।

রামমোহন ছুটে এলো।—ভাত দিই মাষ্টারবাবু?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ।

ঠাঁই করে জল ভরে দিয়ে গেল রামমোহন। প্রিয়তোষ খেতে বসল। মাছের ঝাল, মাছের ঝোল ও মাছের অম্বল। পাতের ধারে মাছ ভাজাও আছে। শুধু মাছের ব্যাপার—ভিন্ন রকমের, ভিন্ন স্বাদের।

এত রকমের মাছ একত্রে খাবার কথা ভারতে পারে না সে

ছোটগিন্নী পাশে বসে হাওয়া করতে লাগলেন। খেতে-খেতে লজ্জা লাগছিল প্রিয়তোষের। ছাত্রের মায়ের এ পরিচর্যাটুকু গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল সে মনে-মনে। তবু এঁদের অন্তরঙ্গতা দেখে মুগ্ধ হলো সে। মুখে কিছু বলতে পারলো না তাই। চুপচাপ খেয়ে চলল।

ছোটগিন্নী প্রশ্ন করলেন হঠাৎ, বাড়িতে আপনার আর কে-কে আছেন মাষ্টারমশাই?

—কেউ না।

—একা থাকেন সোনারপুরে?

—হ্যাঁ।

—কেন, আপনার যে ভাই না কে আছে শুনেছিলাম?

—আছে—তারা ক্যানিং-এ থাকে।

—আপনি তাঁদের সংগে থাকতেন না কেন?

নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন। প্রথম দিনেই এতখানি কৈফিয়ৎ দিতে সে নারাজ।

ঈষৎ বিরক্তির সুরে হয়তো তাই জবাব দিলো উপস্থিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, ওখানে থাকার জায়গার অভাব—মাত্র দু'টি ছোট ঘর।

ছোটগিন্না হয়তো লক্ষ্য করলেন ওর ভাবান্তর। প্রসঙ্গ বদলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আর দু'টো ভাত দিক?

—না।

—সে কি—এত কম খেলে শরীর থাকবে?—রামমোহন!

—না, আর ভাত নেবো না।

—দুধ আছে যে—

—আর দুধ খাবো না এখন।

—শুধু দুধ খান একটু। সকালে যা খেলেন তা' বাসি দুধ—আমাদের দুধ বেলায় আসে।

—কেন?

—সোনারপুর থেকে আসে কিনা।

—কেন, এখানে দুধ পাওয়া যায় না ?

—যাবে না কেন, ওখান থেকে দুধটা ভাল আসে। মানে, নিজেদের লোক আসে কিনা—একেবারে খাঁটি দুধটা দিয়ে যায়।

রামমোহন বড় একবাটি দুধ ইতিমধ্যে পাতের ধারে রেখে গেছে।

অতি ভোজনে উদরে স্থানাভাব ঘটলেও উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতোই তাড়াতাড়ি তা' গলাধঃকরণ করতে গিয়ে এক চুমুক দিয়েই বাটি নামিয়ে রাখতে হলো। দুধের স্বাদ মিষ্টি নয়—নোনা।

ছোটগিন্নী বললেন, কী হলো, খেলেন না যে ?

প্রিয়তোষ বলল, রামমোহন বোধহয় চিনির বদলে খানিকটা নুনই ভুল করে দিয়ে ফেলেছে দুধের মধ্যে।

ছোটগিন্নী হাসলেন, ভুল করে নয়—ইচ্ছে করেই দিয়েছে।

—সেকি !

—আমাদের দেশের লোক নুন দিয়েই দুধ খায়।

—কোথায় দেশ আপনাদের ?

—মেদিনীপুর।

—তা' আমাকে দুধ দিলে চিনি দিয়েই দেবেন।

—আচ্ছা। বসুন একটু—

ছোটগিন্নী সংগে-সংগে উঠে পাশের ঘর থেকে চিনি এনে দিলেন অনেকটা। নুন আর চিনি মিলে নতুন এক স্বাদ সৃষ্টি হলো দুধের।

কোন রকমে গলায় তা ঢেলে দিয়ে প্রিয়তোষ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো, ক'সের দুধ আসে আপনাদের—দু' তিন সের নিশ্চয় ?

—দু'তিন সের কী বলছেন—ওতে কী হবে এতগুলো লোকের ? আটসের করে দিচ্ছিল এতদিন—আপনি এসেছেন আজ, কাল থেকে তাই দশ সের করে দিতে বলেছি।

—দশ সের—একটা পরিবারের জন্য প্রত্যহ দশ সের করে দুধ ? প্রিয়তোষ উঠে দাঁড়ালো হাত ধুতে যাবার জন্য।

ছোটগিন্নী বললেন, দশ সের শুনে অবাক হচ্ছেন মাষ্টারমশাই—এ সংসারে একদিন মনকে মন দুধ আসতো প্রতিদিন। অবশ্য আমরা

তিন জা এক সংগে ছিলাম তখন—আলাদা হইনি। আজকাল সেদিন আর নেই—গভ্‌মেণ্ট সব নিয়ে নিলো না হলে এ সংসারের কর্তা একদিন দুধ দিয়েই পা ধুতেন এবং আঁচাতেন। সাড়ে তিনশ' গাইগরু ছিল কর্তার বলদ বাদে—সেগুলো দেখা শোনার জন্য রাখালই ছিল একশয়ের মতো।

প্রিয়তোষ যেন আজব দেশের গল্প শুনছিল এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে। তাড়াতাড়ি ছুটলো বাথরুমের দিকে।

মুখ ধুয়ে বেরোতে না বেরোতেই দেখলো গামছা আর পান হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ছোটগিন্নী।

ওঁর হাত থেকে গামছাটা নিয়ে মুখ মুছে সেটা ফেরত দিয়ে পান নিয়ে মুখে দিল প্রিয়তোষ। তারপর বেরোবার জন্য পা বাড়াল।

করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে ছোটগিন্নী প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাচ্ছেন এখন—অফিসে ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় অফিস্ আপনার ?

—কলেজষ্ট্রীটে।

—কখন আসবেন ?

—পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই ফিরবো।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নীচে নেমে গেল প্রিয়তোষ। স্টেশন রোড পেরিয়ে বালিগঞ্জ ষ্টেশনে এসে উঠলো দশ মিনিটের মধ্যে। এগারোটা আঠারোর গাড়ি ধরতেই হবে। হ্যাঁ, ইন করেছে গাড়িটা—উঠে পড়লো ভীড় ঠেলে।

কলেজস্ট্রীট পৌঁছতে তবু বারোটা বেজে গেল। যেখানে-যেখানে প্রুফ ছিল ফেরত দিল। না, কাল রবিবার থাকায় আজকের কোন প্রুফ এখনও আসেনি। অবশ্য আসতে পারতো।

এখন সিজেন্ টাইম বইয়ের বাজারে—স্কুলের সিজেন। এখন প্রেসে ওভার টাইম চলে সব জায়গায়—কোথাওবা চব্বিশ ঘণ্টাও কাজ চলে। আসলে প্রকাশকরা পয়সা খরচ করতে চান না। সব প্রুফ, প্রুফ রীডারদের দেন না তাই।

প্রথম প্রুফ অবশ্য প্রায় প্রকাশকই প্রুফ রীডার দিয়ে দেখান। কারণ, তাতে ভুল খুব বেশি থাকে।

কোথাও কোথাও কম্পোজিটারের অমনোযোগীতার দরুণ কপি ছাড়ও থাকে কম বেশি। তাছাড়া লেখকদের হস্তাক্ষরও সকলেরই ঝকঝকে নয়। কেউ বা আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে, কেউবা পেঁচিয়ে লেখেন—কেউবা দ্রুত লেখার চোটে বাক্যের মধ্যে দুটি একটি শব্দ বাদ দিয়েও যান।

এছাড়া বানান ভুলতো আছেই। চলতি ও সাধুভাষার ঘণ্টও বাদ যায় না। প্রকাশকদের দ্বারা সে সব জট ছাড়ানো সম্ভব নয়—তাদের সময়ের অভাব। তাছাড়া সব প্রকাশকই একটা খুব বেশি শিক্ষিত লোকও নন।

বিদ্যার জগতই এই। যাঁরা এ নিয়ে বেসাতি করেন তাঁরা সকলেই বিরাট একটি বিদ্বান নন। অবশ্য আজকাল এর ব্যতিক্রমও যে না ঘটছে তা' নয়—কম্পোজিটারদের মধ্যে দু' চারটি স্কুল ফাইনাল, প্রি. ইউ বা প্রকাশকদের মধ্যে দু'একজন এম. এ., বি. এ. ও পাওয়া যাচ্ছে।

আজকালকার মাষ্টারমশাইরাও প্রত্যেকেই এক একটি দিগ্‌গজ। সবারই নামের শেষে বিরাট-বিরাট ডিগ্রী। যাঁর ওটা আবার একটু বেশি লম্বা তাঁর দাম আর একটু বেশি। আসলে ভাষা জ্ঞান যাঁদের নেই, ঠিক মতো শব্দের প্রয়োগে ভুল, বানানে অজ্ঞতা, আজকাল তাঁরাই বড় বড় মাষ্টার।

মুখস্ত বিদ্যার জোরে মোটা-মোটা ডিগ্রী অর্জন তাঁদের দিয়েছে এ সুযোগ। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা পেয়ে অনুশীলন অভিজ্ঞতা বা পরিশ্রম দ্বারা কেউ-ই যোগ্য হতে চাননি।

মাষ্টারদেরই যদি এই অবস্থা ছাত্ররা তবে দাঁড়ায় কোথায়? ভবিষ্যত তাঁদের কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে?

সরকার যদি এমন একটি নিয়ম করে দিতেন প্রকাশক হতে গেলেই প্রথমে তাকে উচ্চশিক্ষিত হতে হবে তাহলে হয়তো এত প্রকাশক থাকতো না বইয়ের বাজারে। কিন্তু বিদ্যার বাহন যে পুস্তক তা সমৃদ্ধ হতো এবং শিক্ষাও প্রকৃত বন্ধু হতো। কে ভাবে এসব নিয়ে—সময় কোথায়? আর, প্রয়োজনই বা কি—শিক্ষার কুফল যখন ফলতে আরম্ভ করবে তখন আমরা তো আর থাকছি না। অতএব মাথা ব্যথাটা কিসের?

আমরা বলছিলাম প্রুফের কথা।

স্কুল কলেজের বইয়েব প্রথম প্রুফ্‌ সব প্রকাশকবাই প্রুফ্‌ রীডারদের দিয়ে দেখিয়ে থাকেন। অবশ্য দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ প্রুফ্‌ও কোন কোন প্রুফ্‌ রীডার যে না পেয়ে থাকেন এমনও নয়। তবে তাঁরা খুব ভাগ্যবানদেরই দলে।

প্রিয়তোষ প্রায় পনেরো-বিশটা পার্টির কাজ করে। প্রথম প্রুফ্‌ ছাড়া অন্য সব প্রুফ্‌ পায় এরকম পার্টি তার মাত্র একটি।

এখন সেই ঘরে এলো সে। কোম্পানীর নাম "গ্রন্থকেন্দ্র"। মালিক কালো বাবু। নামে ইনি কালো হলেও দেখতে খুব ফরসা। সুন্দর চোখ, মুখ, নাক, মজবুত স্বাস্থ্য। চেহারায় পারিপাট্যে আভিজাত্যের ছাপ্‌।

বাঁকুড়ার কোন এক জমিদার পরিবারের ছেলে এই কালোবাবু। দু' পুরুষ ধরে বইয়ের কারবার ওঁদের বাঁকুড়া শহরে। বাবা ওখানকার বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ীও একজন। প্রকাশন যা করেছেন ওখানেই। সম্প্রতি তিন চার বছর কোলকাতার বাজারে পাঠিয়েছেন ছেলেকে প্রচুর টাকা দিয়ে।

সেই টাকায় বিরাট ব্যবসা ফেঁদেছেন এখানে কালোবাবু। এই ক' বছরে বেশ জমিয়েও নিয়েছেন বাজার। এঁদের অনেক বই। সারা বছরই সেজন্য কাজ চলে এখানে। প্রিয়তোষ বছর দুই ঢুকেছে এখানে। এ ঘরের বাঁধাধরা প্রুফ্‌রীডার সে।

ওকে দেখেই কালোবাবু বলে উঠলেন, প্রুফ্‌ আনতে গেছে—আপনি আছেন তো ওখানে ?

—হ্যাঁ।

ওখানে অর্থে সাউদার্ন বুক এজেন্সীতে। ওটাই প্রিয়তোষের অফিস্‌। অবসর সময়ে কিম্বা কাজ করবার জন্য বসবার জায়গাতো একটা চাই। তাই সব পার্টিকেই সাউদার্নের ঠিকানা বলে দিয়েছে। দরকার হলে ওখানেই খোঁজ করে সবাই ওকে।

গ্রন্থকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আরও দু'পাঁচ জায়গায় ঘুরে সাউদার্নেই এসে বসল প্রিয়তোষ।

নিয়মমত চা এলো এক কাপ—এটা এখানকার প্রাত্যহিক বরাদ্দ। অতিভোজনে চা পানের স্পৃহা আপাততঃ না থাকলেও আপত্তি করলো না সে। যথারীতি কাপটি হাতে তুলে নিল।

যদুবাবু বললেন, সিগারেট আছে ?

প্রিয়তোষ প্যাকেট বার করে দিল পকেট থেকে। যদুবাবু নিঃসঙ্কোচে সিগারেট ধরালেন একটি ওর থেকে।

এমন সময় গ্রন্থ কেন্দ্রের কর্মচারী এলো প্রুফ্‌ নিয়ে। বলল, একটু তাড়াতাড়িই দেখে দেবেন—আজকেই মেক্‌-আপ দেবে বলেছে।

—আচ্ছা।

কর্মচারীটি চলে গেল। প্রিয়তোষ প্রুফ্ দেখতে বসলো। ঘণ্টা দুই বাদে কাজটি শেষ হলে আবার ফেরত দিয়ে এলো তা' গ্রন্থকেন্দ্রে গিয়ে। তারপর বাজারে ঘুরলো খানিকটা।

না, কোন কাজ আসেনি কোথাও এখনো। যদি কিছু আসে তবে তা সন্ধ্যের আগে আর আসবেনা।

কিন্তু আজ অতক্ষণ থাকা যাবেনা। সাড়ে চারটা বা পাঁচটার মধ্যেই বেরোতে হবে কলেজস্ট্রিট থেকে—নাহলে ঠিক সময় পৌঁছনো যাবে·না বালিগঞ্জে।

এখন যদুবাবুকে বলল ভাই, আজ কিন্তু আমি পাঁচটার মধ্যে চলে যাবো—আপনার কোন প্রুফ্ আসবে নাকি?

—আসবার তো কথা। তা' অত তাড়াতাড়ি গেলে চলবে কী করে—কাজ করতে হলে অমনি যখন তখন চলে গেলে হবে না।

—কিন্তু আমি যে একটা ট্যুইশানি নিয়েছি আজ থেকে।

—কোথায়?

—বালিগঞ্জে।

—কি রকম ট্যুইশানি—ছাত্র না ছাত্রী?

—উভয়ই।

—কোন ক্লাশ?

—ফোর ফাইভ্।

—তা' ছাত্র-ছাত্রীদের বড় বোন-টোন আছে দু'একটা তো।

—কেন?

—কেন আবার কি—শুধু তলারই কুড়োবেন, গাছেরও খেতে হবে না? পড়াবেন কী স্বার্থে—একটু হাতের সুখ ও যদি না করতে পারেন তাহলে চলবে কী করে? বয়েসতো হলো—বিয়েতো করতে পারলেন না একটা, দেখুন যদি এবার জয় মা কালী বলে ঝুলে পড়তে পারেন।

প্রিয়তোষের বিশ্রী লাগে এ রসিকতা। বিশেষ করে যদুবাবুর মুখে এ রসিকতা যেন কী রকম বেমানান বলে মনে হয় তার।

এ ধরণের আলাপ আলোচনাও কোনদিন করেনি যে তাঁর সংগে। তাছাড়া, বয়েস হয়েছে লোকটার—প্রায় পঞ্চান্নের মতো তাঁর বয়েস। নিজের ঘরে অনূঢ়া কন্যা ও আছে দু'টি।

না, অত্যন্ত বাজে লোক এই যদুবাবু। একটু আধটু পাপ দোষ আছে তাঁর এখবর প্রিয়তোষের জানা। ক্যানভাসিং-এর ব্যাপারে যখন প্রতিবছরই এক আধমাসের জন্য উত্তরবঙ্গ বা আসামে যান তিনি, তখন হোটেলে মেয়ে-টেয়ে নিয়ে আমোদ স্ফূর্তিও করেন। এ সব গল্প বন্ধু বান্ধবদের আসরে .বেশ ফলাও করে প্রচার করতে শুনেছে ওঁকে প্রিয়তোষ।

কোনদিনই ওঁকে ভালো লাগতো না—আজ আরও কুৎসিত মনে হয়। তবু উপায় নেই এখানে না এসে। প্রথম প্রুফ্ দেখতে নেমে কলেজস্ট্রীটে এসে ওঁর সংগেই আলাপ হয়েছিল সর্বাগ্রে। উনিই প্রথম কাজ দিয়েছিলেন। বসবার জায়গাও দিয়েছেন। এখানে বসে প্রিয়তোষ কাজ করতে পারছে।

এমনিতেই লোকটি ধূর্ত। পয়সা কড়ির ব্যাপাবে খুব টাইট্। -প্রুফের রেট্ও বাজাবেব তুলনায় এখানে অনেক কম। আসলে প্রিয়তোষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছেন ভদ্রলোক পুরোপুরি।

সংসারে এই ধরণের লোকদেরই জয় জয়কার চারিদিকে। ওঁর মুখেই ওঁর গল্প শুনেছে প্রিয়তোষ।

খুব সামান্য অবস্থা থেকেই অবস্থা ফিরিয়েছেন। প্রথম জীবনে একটি বইয়ের দোকানে চাকরি করতেন—তখন নাকি খাওয়া জুটতোনা যদুবাবুর। তারপর একটি বড় প্রকাশকের কাছে চাকরি পেয়েই অবস্থা ফেরান।

এখন যে উত্তরবঙ্গ ও আসামে যদুবাবুর কারবার এককালে ওখানেই পড়ে থাকতে হতো ওঁকে ওই প্রকাশকের চাকরি করবার জন্যে বছরের ছ'সাত মাস। হাজার-হাজার টাকার স্পেসিমেন্ কপি লোপাট্ -করতেন সে সময়।

তাছাড়া, চুরিতো ছিলই। চালানে যে সব পার্টিদের কাছে বই

যেতো তাঁদের সংগেও যোগ-সাজস্ ছিল। মোটা কমিশন মিলতো সেখান থেকে।

এভাবে কয়েক বছর কাটিয়ে গোপনে নিজেই প্রকাশক হয়ে গেলেন একদিন যদুবাবু। দু' তিনটি বইও ছাপালেন তিনি নিজের পয়সায়।

কোম্পানীর পয়সায় খেয়ে, তাঁদেরই পয়সায় হোটেলের ঘর ভাড়া দিয়ে গোপনে নিজের কাজ করতেন তিনি বেনামে, আর বছরে বছরে বই বাড়াতেন। এভাবে যখন নিজের বই হয়ে গেল দশ বারো খানা তখন সুযোগ বুঝে চাকরি ছেড়ে দিলেন এবং স্বনামে একটি ঘর নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন এই সাউদার্ন বুক এজেন্সীর।

এখন যদুবাবুর সংসার বড। ছ'সাতটি ছেলেমেয়ে। গুটি দুই তিন কলেজেও পড়ে।

নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি ইছাপুরে চোদ্দকাঠা জমির উপর। কোথায় নাকি কয়েক বিঘা ধান জমিও করেছেন। তাছাড়া বইয়ের সংখ্যা এখন পঞ্চাশের উপরে। ব্যবসায়ে লক্ষ টাকার উপর মূলধন।

কিছু ওর নিজের ও কিছু পরের মুখ থেকে শুনেছে এ সব প্রিয়তোষ। অপরকে না ঠকালে হয়তো নিজে লাভবান হওয়া যায় না। যদুবাবুর মতো ব্যক্তি সংসারে বিরল নন। বিশেষ করে কলেজস্ট্রীটের বইয়ের পাড়ায় তো নয়ই।

এখনকার অনেক বড়—বড় প্রকাশকদের ইতিহাসও নাকি ওই একই রকম। তবু ওর মধ্যেই চলছে বাংলা বইয়ের জগত কলেজস্ট্রীটের অলিতে-গলিতে ও বড় রাস্তায়। বিরাট বিরাট সাইন বোর্ড—দামী দামী সোফা কেস্। কারো দোকানের সামনে গাড়িও দাঁড়িয়ে থাকে নিজস্ব।

জনশ্রুতি এই যে, এ ব্যবসা নাকি শুধু এক পুরুষের ব্যবসা। অর্থাৎ যিনি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি ছাড়া পরবর্তী পুরুষ এসে নাকি আর টি'কিয়ে রাখতে পারেন না।

এ লাইনের এটাই অভিশাপ। বুক কোম্পানী, কমলা বুক-

ডিপো, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, এ মুখার্জী, নিউএজ ইত্যাদি কোম্পানী-গুলো নাকি তারই সাক্ষ্য বহন করছে। শেষের দুটো যদিও চলছে টিম, টিম, করে কিন্তু বাকিগুলো সব উঠেই গেছে।

তাহলে এখনকার এই মডার্ণ বুক এজেন্সী, দাসগুপ্ত এণ্ড্ কোং, ক্যালকাটা বুক হাউস্, বি. সরকার, মিত্র ও ঘোষ এঁদের অবস্থা কী হবে। পরবর্তী পুরুষে এঁরাও কি লাল বাতি জ্বালাবেন? তাঁদের ছেলেপুলেরা এসে আর করতে পারবেন না ব্যবসা?

যদুবাবুর প্রশ্নের জবাবে কিছু বলল না প্রিয়তোষ দেখে আবারও প্রশ্ন করলেন, কী বললেন না?

—কি বলবো?

—ছাত্র-ছাত্রীদের বড় বোন-টোন আছে কিনা?

—জানিনা। এখনও সেরকম আলাপ হয়নি কারো সংগে।

—তবু বলে রাখলাম যদি সে রকম কেউ থাকে নিয়ে আসবেন এখানে সিনেমা দেখবার নাম করে। পয়সা আপনার লাগবে না—আমরাই দেবো সে পয়সা, আপনি শুধু নিয়ে আসবেন।

—আচ্ছা।

প্রিয়তোষ উঠলো। ততক্ষণে সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে যে সব পার্টিদের প্রুফ্ আসবার কথা তাদের সবার সংগেই দেখা করলো।

বলল, আমি একটু তাড়াতাড়িই চলে যাবো আজ—প্রুফ্ এলে রেখে দেবেন, কাল এসেই দেখে দেবো।

কেউ কেউ বললেন, আচ্ছা। আবার কেউ-কেউ সম্মত হলেন না। পরিষ্কারই বলে দিলেন, সাতটা পর্যন্ত না থাকলে প্রুফ্ রাখা যাবে না—অন্য কাউকে দিয়ে দেবো।

প্রুফ্ রীডারের অভাব নেই কলেজস্ট্রীটে। অনেকেই ঘুরে বেড়ান এ লাইনে এ কাজের জন্য—ফুল টাইম, পার্ট টাইম। অনেককে চেনেও প্রিয়তোষ।

সবাই সবাইকে চিনলেও বোধহয় কেউ-ই কাউকে আন্তরিক গ্রহণ

করতে পারেন না ঠিক। কারণ, আড়ালে সবাই সবার নিন্দে করে বেড়ান—এটা এ লাইনের ধর্ম। ঈর্ষা এখানে নিন্দনীয় নয় বরং ওটা পেশারই অঙ্গ।

সুরেনবাবুর সংগে দেখা পথে। সাউদার্ণের কিছু কিছু কাজ উনিও করেন মাঝে মধ্যে। ওকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, কেমন আছেন?

—ভালো।

—কাজকর্ম কী রকম?

—কই, কাজ কই—আজ একটা প্রুফ্ দেখেছি মাত্র। আপনার কেমন?

—আমার কাজ থাকে সব সময়।

সুরেনবাবু চলে গেলেন ওকে অতিক্রম করে। হাতে অনেকগুলি প্রুফের বাণ্ডিল। হয়তো দেখে ফেরত দিতে যাচ্ছেন কিম্বা নিয়ে আসছেন দেখবার জন্য।

এ লাইনে অনেকদিনই আছেন তিনি। রেট্ও খুব কম তাঁর। উনি মুখে স্বীকার না করলেও শোনা যায় উনি নাকি আট আনা বারো আনায়ও প্রুফ্ দেখেন। কী করে পোষায় ভদ্রলোকের কে জানে।

শিয়ালদার পথ ধরলো প্রিয়তোষ। এখন সওয়া পাঁচটা। ছ'টা চল্লিশের আগে কোন ট্রেন ধরা যাবে না, আর একটু আগে বেরোলে হতো। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল একটু সে।

দ্রুত এ সময় এপথ দিয়ে হাঁটার উপায় নেই। বিশেষ করে "পূরবী"র পর থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত আরো মুস্কিল। দু'পাশের ফুটপাত ও রাস্তার অর্ধেকটা জুড়েই বসে যায় তরি-তরকারী বাজার। তার উপর আছে ফলওয়ালা, ফিরিওয়ালা ও পথচারিদের ভিড়।

সাবধানে এবং খুব ধীরে পথটুকু অতিক্রম করতে করতে নিজেকে ভাবতে থাকে প্রিয়তোষ, হয়তো দু'একটা পার্টির কাজ চলে যাবে এবার। কারণ, পাঁচটার মধ্যে ওঁদের প্রুফ আসবে না আর পরের দিন এগারোটা পর্যন্ত রেখে দেবেন না তারা—যাকে সামনে পাবেন তাকে দিয়েই দেবেন।

ট্যুইসানি ও প্রুফ্ দেখা দু'টোই বজায় রাখতে চায় প্রিয়তোষ। কারণ, দু'টোই অস্থায়ী। কোনটা টিঁকবে কে জানে।

তের নম্বর ষ্টেশান রোডে পৌঁছতে ছ'টা বেজে গেল। শীতের সন্ধ্যা অনেকক্ষণই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ইস্, বড্ড দেরি হয়ে গেল। ছাত্র-ছাত্রীদের গার্জিয়ানরা কী ভাববেন কে জানে। না, কাল থেকে আরো আধঘণ্টা আগে ফিরতে হবে অন্ততঃ।

রাত্রে তিনজনে পড়বে। কম করেও আড়াই ঘণ্টা পড়ানো দরকার। সাড়ে আটটা ন'টা পর্যন্ত যাবে পড়ানোতে তারপর খেয়ে দেয়ে বেরোতে নিশ্চয় দশটা হবে। সোনারপুরে পৌঁছতে এগারোটা। তারপর নিজের লেখাপড়া বা প্রুফ্ থাকলে তা' দেখবে কখন সে? শুতে বেশি রাত হলে পরের দিন ভোর পাঁচটায় উঠতে অসুবিধা হবে।

অবশ্য বালিগঞ্জে থাকতেও পারে সে। কিন্তু চট্ করে ওখানে থাকতে সম্মত হওয়া যাচ্ছেনা। তাতে রবিবার বা ছুটি-ছাটার দিনও পড়াতে হবে। তাছাড়া পরের আশ্রয়ে থাকাটাকে যুক্তিযুক্ত মনে করে না সে।

অনুরাধার একটি কথাকে বেদবাক্য বলে মনে হয়েছে তার। দিদি বলেছিল, পর ভাতী হয়ো তবু পর ঘরী হয়োনা। না, যত রাত হোক সোনারপুর ফিরে যেতে হবে রোজ রাতে। ওখানে ঘর রয়েছে তার— জিনিষপত্রও রয়েছে। ঘর পাহারা দিতে হবেতো।

সোজা ত্রিতলে উঠে এলো প্রিয়তোষ হন্তদন্ত হয়েই। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেই প্রথম চারখানি ঘর মেজকর্তার—তারপরের চারটি ছোটকর্তার। বড়কর্তা পুরো দ্বিতলটায় থাকেন।

ঐ সব নাকি টেম্পোরারী ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে পুরো বাড়িটায় বড়-

কর্তা একাই থাকবেন। ছোট ও মেজ তারা উঠে যাবে কালিঘাটের বাড়িতে। কলকাতার বাড়ি দু'টি এভাবেই ভাগ হয়েছে তিন ভাইয়ের মধ্যে।

এ বাড়িটি চারতলা। একদম উপরের তলাটায় রান্না ঘর চাকর বাকরদের থাকার ঘর। এখন ওটা বড় তরফের। একতলায় অফিস ঘর ও জ্ঞাতিগুষ্ঠির আশ্রয়স্থান। দেশের ক'টি ছেলে থাকে ওখানে। একতলার উপরে ওঠবার হুকুম নেই তাদের।

করিডোর পেরিয়ে রামমোহনের ঘরে ঢুকলো প্রিয়তোষ।

রামমোহন ঘরের মেঝেয় বসে একটি বড় কড়াই থেকে জ্বাল্ দেওয়া দুধ বাটিতে-বাটিতে তুলছিল হাতার সাহায্যে। দীপক তক্তপোষের উপর পা ছড়িয়ে বসে বড় একথালা মুড়ি ভক্ষণে রত। অঞ্জু চুলে বিনুনি করছিল। অমিতা রামমোহনের পিঠের উপর পিছন ফিরে বসে কলা খাওয়ায় ব্যস্ত।

প্রিয়তোষ ঢোকা মাত্র অঞ্জু অমিতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দীপকের ভাবান্তর দেখা গেল না কিছু। সে যেমন মুড়ি চিবোচ্ছিল তেমনি চিবাতে চিবাতে প্রশ্ন করলো, এত দেরি হলো মাস্টার মশাই?

ছাত্রের প্রশ্নে মাস্টার বিরক্তি বোধ করলো একটু। তাই কিছু জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো ওকে, অসময়ে এখন খেতে বসেছো কেন—বইখাতা নিয়ে বসতে পারোনি?

—যাচ্ছি মাস্টার মশাই।

দীপক উঠলো যেন খানিকটা অনিচ্ছার সংগেই। বলল, ওঘরে চলুন—রাত্রে ও ঘরেই বসবো আমরা।

—কেন?

—মা বলেছে।

—উনি কোথায়?

—বাজারে গেছে।

—চলো—

ছাত্রের সংগে সংগে সামনের ঘরে এলো প্রিয়তোষ। অঞ্জু ও

ও অমিতা বই নিয়ে বসে গিয়েছিল তক্তপোষের উপর। দীপক ও তার মায়ের ঘর থেকে নিজের বই খাতা নিয়ে এসে বসলো। প্রিয়তোষ বসলো চেয়ারটা টেনে নিয়ে।

রামমোহন এ সময় ছাত্র-ছাত্রীদের দুধ দিয়ে গেল। অঞ্জু ওকে বলল, মাস্টার মশায়কে খেতে দাও রামমোহনদা'।

—হ্যাঁ দিচ্ছি।

একটু পরে জল খাবার নিয়ে এলো রামমোহন। দুধ, মুড়ি কলা আর চিনি। প্রিয়তোষ খেয়ে নিলো প্রথমে। তারপর পড়ানোতে মন দিল।

কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ নেই কারো পড়াতে। কারো জল পিপাসা, কারো ঘুম, কারো প্রস্রাব পায়খানা। তবু ওর মধ্যে চলল শিক্ষা দানের পালা।

ছোট গিন্নী এলেন একটু পরে। বললেন, চা খেয়েছেন মাস্টার মশায়?

—না।

রামমোহনকে চায়ের অর্ডার দিলেন অমনি ছোট গিন্নী।

তারপর পাশের ঘর থেকে পোষাক বদলে এসে আবার বললেন, খুব পেটাবেন মাস্টার মশায়—এগুলো সব গরু, না পেটালে হবেনা এদের। আগের মাস্টার মশায় খুব পেটাতেন বলে তবু একটু শিখেছে না হলে মোটেই শিখতো না।

—তা' তিনি চলে গেলেন কেন?

—হঠাৎ চাকরি পেয়ে গেলেন জলপাইগুড়িতে তাই চলে গেলেন। এখানে থেকে পড়াশোনা করতো কলেজে।

—কতদিন ছিলেন তিনি?

—প্রায় বছর খানেক।

—তার আগে ক'জন ছিল।

—চার জন।

—আমি তাহলে ষষ্ঠ?

দীপক বলে উঠলো এসময়, মারলে আমার আর লাগে না মাস্টার মশায়—মার খেয়ে খেয়ে পিঠ শক্ত হয়ে গেছে, দেখবেন ?

—থাক !

ছাত্রকে ধমক দিয়ে ছোট গিন্নীকে বলল প্রিয়তোষ, বারবার মাস্টার বদলানো ভালো না—তাছাড়া মার-ধোর করে পড়ানোটা অত্যন্ত বাজে জিনিষ, ওতে ছাত্রদের উন্নতি হয়না। পড়াটা হচ্ছে আনন্দের ব্যাপার—যদি ছাত্রদের সেটা বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ওরা নিজেরাই পড়বে। তবে মাস্টার মশাইদের একটু ধৈর্য্যের দরকার। যাই হোক, ওসব পেটানো টেটানো কিন্তু আমি পারবো না—আমি পড়াবো অন্যভাবে।

—সেই জন্যেইতো আপনাকে আনা। মনে হচ্ছে আপনি পারবেন এ গুলোকে মানুষ করতে।

—কি করে বুঝলেন—আমি তো আজ প্রথম এলাম ?

—এর আগে এতক্ষণ ওরা বসেই থাকতো না—

ছোটগিন্নী চলে গেলেন তাঁর কাজে। প্রিয়তোষ পড়ানোতে মন দিল। একটানা পড়াতে গিয়ে দেখলো সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। এবার ছুটি দিতে হয়। সে উঠলো।

আমিতা আগেই উঠে গিয়েছিল। অনু বইখাতা গোছালো। দীপক তো জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দ অনুভব করলো। এতক্ষন ঝিমোচ্ছিল সে। এবার লাফিয়ে উঠে রামমোহনের কাছে গিয়ে হম্বি তম্বি করতে লাগলো। বেচারীর অপরাধ সে বিকেলে ডিম কিনে আনেনি ওর জন্য। এখন যে ওমলেট খাবার ইচ্ছে হয়েছে বাবুর।

খাবার ডাক কখন পড়বে কে জানে। রাত হয়ে যাচ্ছে। কয়েক মিনিট দেখে অনুকে দিয়ে ছোট গিন্নীকে ডাকিয়ে বললে, রান্নার কদ্দুর—আমি বাড়ি যাবো।

—এতরাতে বাড়ি গিয়ে কী করবেন—সেইতো শীতের মধ্যে সকালে আসতে হবে।

—তবু যেতে হবে, মানে, ওদিকে বাসা-বাড়িতো—ঘর খালি থাকবে।

—ঘরে খুব জিনিস পত্র আছে বুঝি ?

—না, তেমন কিছু না—তবু গরীবের যেটুকুই যায় সেটুকুই অনেক। যা রান্না হয়েছে তাই দিয়ে আমাকে খেতে দিতে বলুন।

—আচ্ছা।

ছোটগিন্নী সঙ্গে সঙ্গে হাঁক পাড়লেন, রামমোহন—

—আজ্ঞে। রান্না করতে-করতে খুন্তি হাতে ছুটে এলো রামমোহন।

—মাষ্টার মহাশয়কে খেতে দাও!

—দিচ্ছি। রামমোহন চলে গেল। ছোট গিন্নীও তাঁর ঘরে ঢুকলেন।

খাবার ডাক আসতে তবু আরো কিছুক্ষণ দেরি হলো। প্রিয়তোষ বিরক্ত হচ্ছিল। তবু উপায় নেই সহ্য না করে। না খেয়ে চলে আসাটা অভদ্রতা।

আসন পেতে জলের গ্লাস সাজিয়ে ছোটগিন্নী বসেছিলেন সকালের মতো। সে বসতেই জিজ্ঞেস্ করলেন, কী খাবেন মাষ্টার মশায়—ভাত না রুটি ?

—যা দেবেন।

—আপনি যেটা পছন্দ করেন বলুন।

—কি হয়েছে আপনাদের ?

—আমাদের দু'টোই হয় রাতে। যার যেটা খুশি তাই খায়। বালিগঞ্জ রেশনিং এরিয়া। চালের বরাদ্দ নিয়ে অভাব এখানে। তাই সঙ্কোচের সঙ্গেই বলল, আমাকে রুটিই দিন।

পাশেই একটি থালায় একগাদা রুটি ছিল। গোনা গাথা নেই, যে ক'টা উঠলো একবারে ওর থালায় দিয়ে দিলেন ছোটগিন্নী।

রামমোহন এসে বাটি সাজিয়ে দিয়ে গেল। ও বেলার মতো তিন

রকমের মাছ—ঝোল, ঝাল ও টক আর একবাটি দুধ। বললো, খাওয়া হলে বলবেন মাষ্টার বাবু—গরম ভাত দেবো ?

দরকার হলে বলবো। প্রিয়তোষ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিতে ব্যস্ত হলো।

ছোটগিন্নী পাশেই বসে ছিলেন। বললেন, চিনি দেবো তো ?

—হ্যাঁ।

চিনির কৌটো রামমোহন আগেই পাশে রেখে গিয়েছিল। একমুঠো চিনি ওর থেকে তুলে নিয়ে দুধের বাটিতে দিলেন এখন ছোটগিন্নী।

খেতে খেতে প্রিয়তোষ বললো, ছেলে মেয়েরা কোথায় গেল— ওরা খাবে কখন ?

—অমি ঘুমোচ্ছে। দীপক ওরা ওদের বাবা এলে খাবে।

—উনি কোথায়—

—বেরিয়েছেন।

—সকালে দেখলাম না তো।

—খুব ভোরে বেরিয়েছিলেন। দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়েছিলেন একটু। সন্ধ্যায় আবার বেরিয়েছেন।

—কখন ফিরবেন ?

—ঠিক নেই। এগারোটা-বারোটা হবে। সোনারপুরে গেছেন।

—ছেলে মেয়েরা জেগে থাকবে অতক্ষণ ?

—হ্যাঁ।

—না, ওদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন কাল থেকে দশটার মধ্যে, তাড়াতাড়ি না শু'লে সকালে উঠবে কী করে ? আমি কিন্তু সাড়ে ছ'টার মধ্যে এসে যাবো—তার আগে যেন উঠে যায়।

বেরোতে বেরোতে সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল প্রিয়তোষের। সংগে সংগে ট্রেন পাওয়া গেলেও বাসায় পৌঁছতে এগারোটা বেজে

গেল। পাড়া নীরব হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এ দিকটা গ্রাম মতো। কোন বাড়ির আলো জ্বালা নেই আর। বাড়িউলির ঘরও অন্ধকার—ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। শুধু এ বাড়ির প্রবেশের মুখের দেশি মদের অবৈধ দোকানটি খোলা রয়েছে।

ওকে এত রাতে ফিরতে দেখে ওরা হয়তো বিস্মিত হয়েছিল একটু। তবু সঙ্কোচে পথ ছেড়ে দিল। প্রিয়তোষ তালা খুলে ঘরে ঢুকলো। আজ রাতে প্রুফ্‌ নেই।

অতএব, শুয়ে পড়া যেতে পারে। আলো জ্বেলে প্রথমে বিছানা পাতলো প্রিয়তোষ। তারপর জামা কাপড় ছেড়ে টাইম পিসে এলার্ম দিয়ে শুয়ে পড়লো।

উঠলো সাড়ে পাঁচটায়। হাত মুখ ধুয়ে চা খেলো এক কাপ। তারপর বেরোলো। ছ'টা আটের গাড়ি ধরে সাড়ে ছ'টায় পৌঁছাল লাল বাড়িতে। উঠে এলো সোজা উপরে। হ্যাঁ, আজ সবাই আগে উঠে গেছে।

দীপক বসেছিল করিডোরে দেয়ালে হেলান দিয়ে। প্রিয়তোষ বললো, হাত মুখ ধুয়েছো?

—না।

—যাও হাত মুখ ধু'য়ে বই খাতা নিয়ে এসো!

অনেকটা অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে পড়ে দীপক। ধীরে ধীরে এগোয় বাথরুমের দিকে।

রামমোহনের ঘরে ঢুকে চেয়ারটা টেনে এনে তক্তপোষের কাছে এগিয়ে বসলো প্রিয়তোষ।

ছাত্র এলো কয়েক মিনিট পরে। অঞ্জু, অমিতাকে স্কুলে দিতে রামমোহন বেরিয়ে গেল। যথারীতি প্রাতঃরাশ দিয়ে গেলেন ছোটগিন্নী।

সেই দুধ, মুড়ি, চিনি আর কলা। পরিমাণ কালকের মতো।

খেতে খেতে প্রিয়তোষের মনে হলো একবার, এখানে থাকলে যাই হোক আর না হোক স্বাস্থ্যটা ভাল হবে একটু নিশ্চয়।

চা এলো আটটায়। রামমোহন ফিরে এসে উনুন ধরিয়ে চা দিলো।

ছোটগিন্নী এলেন এ সময় এ ঘরে। বললেন, কাল বাড়ী যেতে অনেক রাত হয়েছিল মাষ্টার মশাই?

—হ্যাঁ। এগারোটায় পৌঁচেছি।

—কষ্ট হলো তো খুব?

—না। কষ্টের কী আছে।

—এখন ক'টা দিন যদি কষ্ট করে এখানে কাটাতে পারতেন। এ বাড়িতে ঘর কম তাই আলাদা ঘর দিতে পারলাম না আপনাকে। সামনের মাসেই কালিঘাটের বাড়ি যাবো আমরা—তখন আর অসুবিধা হবে না আপনার। ও বাড়িতে অনেকগুলো ঘর খালি আছে।

—ঠিক আছে, এত ব্যস্ত হবার কি আছে? ক'টা দিন এভাবেই কাটিয়ে দি'না—অসুবিধে হলে বলবো আপনাদেব।

—ওদিকে ঘব ভাড়া দেবেন তো শুধু শুধু?

—তা'তো দিতে হবে।

—কেন, এক কাজ করুন না। ঘর ছেড়ে দিন—মালপত্র যা আছে নিয়ে কালিঘাটের বাড়িতে বাখুন। অসুবিধা হলে ওখানে গিয়ে থাকুন দু'একটা ঘর নিয়ে।

—সে তো একই সমস্যা। সেই তো কালিঘাট থেকে রোজ সকালে আসতে হবে এখানে। রাতে খাবাব পর আবার শু'তে যেতে হবে ওখানে। ওব থেকে যেমন চলছে চলুক—আপনাবা যখন যাবেন ও বাড়িতে, আমিও তখন যাবো।

আসলে কিছুদিন না দেখে চট্‌করে পর ঘরী হবার ইচ্ছা ছিল না প্রিয়তোষের। ছোটগিন্নী নিজের কাজে চলে গেলেন এবার।

দীপক এতক্ষণ ইতিহাস পড়ছিল। এবার পড়া থামিয়ে বললো, অনেকগুলো অঙ্ক আছে মাষ্টার মশাই—এখন অঙ্ক কোরবো?

—করো।

দীপক খাতা কলম বার করে অঙ্ক করায় মন দিল। প্রিয়তোষ এই ফাঁকে ওর ইতিহাসের বইটা উল্টেপাল্টে দেখছিল একটু।

বিষয়টি তার খুব প্রিয়। যদিও নিচু ক্লাশের ইতিহাস এবং যদিও সব জানা তবু বেশ মনোযোগ সহকারে বইখানি দেখছিল সে।

একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো চেয়ারের পাশে। কিশোরী। বয়েস বড় জোর তের চোদ্দ। শ্যামলা গায়ের রঙ্। নাক চোখ মুখ খুব সুন্দর নয়। ছোট-ছোট খোলা চুল কাঁধের নীচ পর্যন্ত নামানো। পরণে একটি সাদা লংক্লথের অতি সাধারণ ময়লা ফ্রক্।

বললো, পৃথিবী ইংরাজী কি মাষ্টার মশাই?

—আর্থ।

— বানান?

—ই, এ, আর, টি, এইচ—

মেয়েটির হাতে একটি খাতা আর পেন্সিল ছিল। সে চট্ করে ওতে আর্থ বানানটা হয়তো লিখে নি'ল। তারপর চলে না গিয়ে দীপকের কাছে সরে গিয়ে একটু ঝুঁকে ওর খাতার দিকে তাকিয়ে বললো, কি অঙ্ক করছিস রে? ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দীপক ধমকে দিল ওকে, তোর কী দরকার?

—না দরকার আবার কি—এমনি জিজ্ঞেস্ করছিলাম আর কি!

—যা, ভাগ্—আমাদের মাষ্টার মহাশয়ের কাছে এসেছিস কেন রে?

মেয়েটি হয়তো অপ্রস্তুত হলো একটু। কথা না বাড়িয়ে স্থান-ত্যাগ করলো ধীরে ধীরে?

প্রিয়তোষ প্রশ্ন করলো ছাত্রকে, মেয়েটি কে?

—জ্যাঠার মেয়ে।

—কি নাম ওর?

—পাপিয়া।

—কোথায় থাকে?

—নীচে।

প্রিয়তোষ জানতো নিচতলার কথা। এ বাড়ির নিচতলাটা শুধু জ্ঞাতি গুষ্টি ও দেশের লোকেদের আশ্রয়স্থল বিনে পয়সায়।

পাপিয়া নিশ্চয় অমনি কোন আশ্রিতার মেয়ে। হয়তো গরীব। নিশ্চয় পড়ার আগ্রহ আছে—সুযোগ পায় না। ওর জন্য মনে মনে সহানুভূতি জাগলো এখন।

ঠিক সাড়ে ন'টায় ছাত্রকে ছুটি দিয়ে দিল প্রিয়তোষ। নাওয়া-খাওয়া করে বেরোতে হবে এবার যদিও, তবু স্নানে যাবার আগে এক কাপ চা পেলে ভালো হতো। দু'তিন ঘণ্টা বিদ্যাদান করে এখন সে ক্লান্ত। কিন্তু লজ্জা করলো চায়ের কথা বলতে।

এ বাড়িতে ও পাঠ নেই এটা সে শুনেছে। শুধু তার জন্যই চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অতএব, ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। দশ পনেরো মিনিট পরেই না হয় স্নানে যাওয়া যাবে। ক্লান্তি দূর করার জন্য করিডোর পেরিয়ে ছোট গিন্নীর শয়ন কক্ষের পাশের ছোট ঘরটায় এলো।

এ ঘরটা এদের বসার ঘর। ওধারে টেবিলের ওপর রেডিও, তার সামনে দু'টি গদি আঁটা চেয়ার। ওর একটিতে বসে রেডিও খুলল। বিরাট অল্‌ওয়েভ্ সেট্। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা সেণ্টার পাওয়া গেল। হিন্দী গান চলছে—একটি হিট্ করা রোম্যাণ্টিক ছবির গান। মন্দ লাগছিল না শুনতে।

ছোটকর্তা এলেন এ ঘরে। চোখ মুখ দেখে বোঝা গেল এখুনি ঘুম থেকে উঠে এসেছেন তিনি। ওর পাশের শূন্য চেয়ারটির উপর পা তুলে বসে প্রশ্ন করলেন, আমাদের এখানে কেমন লাগছে মাষ্টার-মশায়?

—মন্দ না।

—ছাত্র-ছাত্রীদের দেখে কী বুঝছেন—হবে?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ হবে—না আবার কী আছে? তবে মনে হয় ইতিপূর্বে

এদের ঠিকমতো শিক্ষা দেওয়া হয়নি বা অযথা মার-ধোর করা হয়েছে বলেই একটু বেয়াড়া হয়ে গেছে এরা।

ছোটবাবু পা নামালেন এবার। হয়তো বুঝলেন এতক্ষণে এভাবে বসাটা অভদ্রতা।

তাই ঠিক হয়ে বসে ভদ্র লোকের সামনে আর একটু ভদ্রতা প্রকাশের জন্যই হাঁকলেন, এই রামমোহন—

—আজ্ঞে—রামমোহন ছুটে এলো। হাতে খুন্তী। রান্নার কাজে এত ব্যস্ত ছিল যে ওটা রেখে আসবারও সময় পায়নি।

ছোটবাবু বললেন, মাষ্টার মশায়কে চা দিয়েছো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর একটু দে।

—আচ্ছা।

রামমোহন চলে যাচ্ছিল। ছোটকর্তা আবার ডাকলেন, এই শোনো—

—আজ্ঞে?

— আমাকেও একটু দিও—বুঝলে?

দীপক কোথায় ছিল, ছুটে এলো। বললো, রামমোহনদা, আমাকেও একটু!

রামমোহন চলে গেল।

ছোটগিন্নী পাশের ঘরেই ছিলেন। সদ্য স্নান করে প্রসাধন সেরে এসেছেন। একেই রূপ ধরে না অঙ্গে তায় মাজা ঘষায় জৌলুস যেন ঝরছে না গায়ে। পরিধানে অতি মূল্যবান বেনারসী একখানা আটপৌরে ভাবে পরা।

ওধারের তক্তপোসের উপর পা ঝুলিয়ে বসে মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে বললেন, আচ্ছা মাষ্টার মশায়, চা আপনারা এত কেন খান?

ছোটবাবু জবাব দিলেন এ কথার, তুমি কি বুঝবে চায়ের দাম—খেয়েছো কখনো, যারা খায় তারাই বোঝে ওটা কি জিনিষ।

—আমার দরকার নেই বুঝে। যা খেলে শরীর খারাপ হয়, পয়সা দিয়ে কেন খাবো তা? দরকার হলে দুধ খাও ওই পয়সা দিয়ে —ক্ষতি হবে না, স্বাস্থ্যও ভালো হবে।

প্রিয়তোষ বললো, তা ঠিক। তবে কি জানেন, দুধ সব সময় পাওয়া যায় না—দামও অনেক। তাছাড়া, একটা উপকারিতাও আছে ওর—ক্লান্তি দূর করতে তা অব্যর্থ।

—ছাই—দুধের সঙ্গে চা?

ছোটকর্তা উঠে দাঁড়ালেন এবার। রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, আসল কথা তা' নয় মাষ্টার মহাশয়—পয়সা। আসলে উনি একটু কৃপণ মানুষ—বাজে পয়সা খরচ হবে সেই ভয়ে উনি চা কখনো খান্ না।

ছোটগিন্নী বললেন, আমি কৃপণ—আমি কৃপণ হলে এতদিনে অনেক টাকা রাখতে পারতাম। দেখতো বড়দিকে—কী রকম হিসেব করে সংসার করে। তোমাদের তিন ভায়ের মধ্যে তোমার সংসারই ছোট। অথচ মেজদি আর বড়দির সংসার আড়াই হাজার টাকায় চলে যায়—তোমার সংসার তিন হাজারেও মাস চলে না।

—সে তো তোমার জন্য—তুমি কম বাজার করতে পারো না—

—কী, আমি বেশী বাজার করি? এবার থেকে তাহলে তুমিই বাজার করবে—আমি পারবো না আর বাজারে যেতে।

—তা' তুমি যাও কেন, লোক দিয়ে করালেই পারো?

—হ্যাঁ তা' পারি। কিন্তু বাবু একথাও বলে রাখছি, তা'হলে দেখবে তিন কেন চার হাজারেও মাস চলবে না তোমার।

নেহাত পারিবারিক ব্যাপার এসে যাচ্ছে দেখে প্রিয়তোষ থামালো ওঁদের। বললো, আপনি থামুনতো বৌদি—উনি যা-ই বলুন, কৃপণ যে আপনি নন, তা' এই দু'দিনেই আমি বুঝে নিয়েছি।

রামমোহন এ সময় দু'পেয়ালা ধূমায়িত চা এনে হাজির করলো। দু'জনে হাত বাড়িয়ে পেয়ালা দুটি তুলে নিয়ে তা' পান করতে

মনোযোগী হলো। ছোটগিন্নী উঠে গেলেন। বোধ হয় এ আসরে থাকাটা আর যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না তিনি।

দীপক ঘরেই ছিল। মা বাবার ঝগড়ার মাঝে চুপ করে ছিল সে! এখন চা এলো অথচ সে পেল না দেখে চটে গেল। টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে সে হাঁকলো. এই রামমোহনদা—আমার চা কই?

একদম ভুলে গেছি দাদাবাবু—ও বেলা ঠিক দেবো তোমাকে।

—না, আমার এখনই চা চাই।

বলেই কাঁদতে-কাঁদতে লাফাতে শুরু করলো সে এবার। প্রিয়তোষ ধমকে দিল ওকে, এই হচ্ছে কি—

—আমাকে চা দেয়নি কেন?

—ভুলে গেছে তাই দেয়নি—তা বলে তুমি লাফাবে? এসো, এদিকে এসো—

ধীরে ধীরে মাষ্টারের কাছে এগিয়ে এলো ছাত্র। মাষ্টার ওর গায়ে হাত দিয়ে বললো অন্তরঙ্গ স্বরে, ছিঃ, ও রকম করতে নেই—মনে থাকবে তো?

—আজ্ঞে।

—যাও স্নান করো গিয়ে—দশটা তো বেজে গেল, স্কুলে যেতে হবে না? আর হ্যাঁ, আজ কিন্তু অবশ্যই রুটিন লিখে আনবে খাতায়—আমি সন্ধ্যায় এসে দেখবো।

দীপক বেরিয়ে গেল নীরবে ঘর থেকে।

ছোটকর্তা বললেন, বেশ তো ঠাণ্ডা করে দিলেন দেখছি—

আপনি না থাকলে এতক্ষণ লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে দিতো না—সব ভেঙেচুরে তছ্‌নছ্‌ করে দিতো। রামমোহন ব্যাটার ভাগ্য ভালো—আপনি না থাকলে কিল্‌-ঘুঁষি মেরে হয়তো গুড়িয়ে দিতো ওকে এতক্ষণে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, রাগলে ওর হুঁশ্‌জ্ঞান থাকে না।

—এটা তো, ভাল কথা নয়।

—ভালো মন্দ বুঝি না—পিটিয়ে-পিটিয়ে আমি এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। বেশ বুঝেছি মানুষ হবে না ও'। তবে কি জানেন, একটি মাত্র ছেলে—ও' যদি মানুষ না হয় তা'হলে দুঃখের সীমা থাকবে না আর আমাদের।

—ঠিক। কিন্তু, কিছু ভাববেন না আপনি—আমি সব ঠিক করে নেবো। তবে একটা কথা—কোন বিষয়ে বাধা দিতে পারবেন না আমাকে। হয়তো অনেক সময় দেখবেন পড়াবো না আমি, গল্প করবো কিংবা খেলা করবো ওদের সঙ্গে—কিছু বলতে পারবেন না কিন্তু আমাকে

—না না বলবো কেন—আপনি যে ভাকে খুশি মানুষ করুন ওকে, সব দায়িত্ব আপনার।

দরকার হলে মাঝে মাঝে বেড়াতেও যাবো কিন্তু আমরা।

—নিশ্চয় যাবেন।

—সামনের রবিবার তা'হলে একটা প্রোগ্রাম করে ফেলি?

—করুন। যাবার আগে বলবেন আমাকে—পয়সা কড়ি কিছু লাগবে তো?

—আচ্ছা।

প্রিয়তোষ উঠলো স্নান করলো। তারপর খেতে বসলো। দীপকও বসলো খেতে—সে স্কুলে যাবে।

মাষ্টার বললো ছাত্রকে, বেড়াতে যাবে?

—কোথায়?

—যেখানে হোক!

—কবে?

—সামনের রবিবার চলো।

—ঠিক নিয়ে যাবেন তো?

—নিশ্চয়ই।

ছোটগিন্নী পাশে বসেছিলেন। যদিও শীতকাল তবু খাবার সময় পাখা হাতে বসা তাঁর অভ্যেস হয়তো। যথারীতি বসেছেন গুরু ও

শিষ্যের মাঝখানে। খাবার তদারকি করছিলেন। বলে উঠলেন এ সময় ছেলেকে উদ্দেশ্য ক'রে, বেড়াবার খুব সখ—পড়তে ইচ্ছে করে না।

দীপক কিছু বলল না। মাথাটা নিচু হয়ে এলো তার।

ছোটগিন্নী আবার বললেন, পড়ো ভালো ক'রে তাহলে অনেক বেড়াতে পাবে।

প্রিয়তোষ বলল, হ্যাঁ পড়া চাই আগে—জানোতো, লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে। তোমরা যদি অনেক করে পড়ো তাহলে অনেক গাড়ি-ঘোড়া চড়তে পাবে—মানে, বেড়াতে পাবে। তা' পড়বে তো ভালো করে এবার থেকে?

—হ্যাঁ—

অঞ্জু ও অমি এসে পড়লো এ সময় স্কুল থেকে। রামমোহন প্রতিদিন আনতে যায়।

আজ ওরা নিজেরাই এসে পড়েছে পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে। কী একটা ব্যাপারে স্কুল একঘণ্টা আগে ছুটি হয়ে গিয়েছিল আজ।

দীপক বললো অঞ্জুকে, জানিস অঞ্জু, আমি আর মাষ্টার মশাই না বেড়াতে যাচ্ছি রবিবার।

—সত্যি?

—সত্যি না তো মিথ্যে বলছি—মাকে জিজ্ঞেস্ কর?

অঞ্জু অমনি বইয়ের স্যুটকেস্ ঢিব্ করে মেঝেয় নামিয়ে রেখে ছুটে গিয়ে পেছন থেকে দু'হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করলো, সত্যি মা?

ওর এই অতর্কিত আক্রমণে মাথার ঘোমটাটা খসে পড়ে গেল মুহূর্তেই ছোটগিন্নীর। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটাটি মাথায় তুলে দিলেন আবার। তারপর বললেন, না, কোথায় যাবে?

—কোথায় যাবে মানে—রবিবার আমি যাবোই, মাষ্টার মশাই বলল না?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ যাবে—সবাই যাবে—তুমি আমি অঞ্জু, কেউ বাদ যাবো।

না আমরা। তবে মনে রেখো, যে ভাল করে পড়বে না সে কিন্তু বাদ।

ক' মিনিট প'রে খেয়ে উঠলো প্রিয়তোষ। হাতমুখ ধুয়ে ছোটগিন্নীর দেওয়া পান চিবোতে চিবোতে নিচে নেমে দেখল সাড়ে এগারোটা। না, আজও দেরি হয়ে গেল—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো সে এখন ষ্টেশনের দিকে।

যথারীতি এলো কলেজ স্ট্রিটে। যদুবাবুর ওখানে হাজিরা দিয়েই বাজারে বেরোলো। এক জায়গায় প্রুফ্ এসে পড়েছিল একটা। নিয়ে নিলো তারপর চললো গ্রন্থ কেন্দ্রের দিকে। পথে দেখা ওদের কর্মচারীর সঙ্গে। বলল, যাচ্ছিলাম আপনার কাছে।

—কেন?

—প্রুফ্ আছে।

গোটাতিনেক প্রুফ দিল সে। সব নিয়ে সাউদার্নে এলো আবার প্রিয়তোষ।

যদুবাবুর মেজাজটা প্রসন্ন বলেই মনে হচ্ছে বেশ। দোকান খোলবার সংগে সংগেই মোটা বউনি হয়েছে। ওর হাতে তিন চারটে প্রুফ দেখে বললেন, আজ দেখছি আপনার বাজারও ভালো—দেখি, সিগারেট দেখি একটা।

একটা সিগারেট দিলো প্রিয়তোষ। যদুবাবু তাতে অগ্নি সংযোগ করে বললেন, কী ব্যাপার, দেরি হলো যে আজ আসতে?

—তা' একটু হলো!

—খুব পড়াচ্ছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ, একটু পড়াতে হবে বৈকি!

—কী রকম খেলেন আজ—মাছ-টাছ ছিল?

—ছিল মানে—তিন চার রকম। শুধু তাই নয়, প্রতিবারই খাবার সময় বাটি বাটি-দুধ।

পাশের ঘরের মুখার্জী এণ্ড কোং-এর মালিক ধনেশ মুখার্জী

সময় পেলে মাঝে মধ্যে এ ঘরে এসে বসেন আড্ডায়। হয়তো কাউণ্টারে এখন খরিদ্দার ছিল না। এলেন একটু আড্ডা দিতে।

—দেখি একটা চারমিনার!

ভিতরে প্রবেশ করেই ওদের দু'জনের সামনে বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন ধনেশবাবু।

যদুবাবু পকেটে হাত দিলেন না। বললেন, প্রিয়তোষবাবু সিগারেট খাওয়াবেন এখন। ভদ্দর লোকের বাজার এখন বেশ ভালো—তায় রাতারাতি বরাত খুলে গেছে আবার।

—কি রকম?

—উনি এখন রোজ দু'বেলা তিন চার রকম মাছ খাচ্ছেন—বাটি বাটি দুধ কলা। পরেরটাও জুটে যাবে শীগ্‌গিরে।

—তাই নাকি মশাই। ধনেশবাবু আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। চেয়ার টেনে বসে মাধবকে চা আনতে বলে যদুবাবুকে প্রশ্ন করলেন, সত্যি বলছেন? প্রিয়তোষবাবুর কপাল খুলে গেছে তা'হলে—

—হ্যাঁ শোনেন নি! যদুবাবু এবার সবিস্তারে ধনেশবাবুকে প্রিয়তোষের টিউশানির কাহিনী শোনাতে বসলেন।

সবই প্রিয়তোষের কানে যাচ্ছিল। যদুবাবু কিছু ভেজালও মেশাচ্ছিলেন বেশ। কোন প্রতিবাদ না করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ওঁদের দু'জনকে দুটো দিয়ে প্রুফ দেখায় মন দিলো সে। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তিনটে প্রুফ রয়েছে হাতে। বেলা একটা বেজে গেছে—খুব তাড়াতাড়ি দেখলেও চারটে সাড়ে চারটে হবেই।

ওঁরা দু'জনেই সমান। ইতরামি আর নোংরামির দিকেই ঝোঁক বেশি ওঁদের। যে কোন আলোচনাই ওই রসে ভিজিয়ে নিতে ওঁরা অভ্যস্ত। বাধা দিয়ে লাভ নেই।

কলেজস্ট্রিট্ বইয়ের পাড়ার একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ধনেশবাবু। তাঁকে না চেনে এমন প্রকাশক কেউ নেই এ অঞ্চলে। কারণ, তার ক্যালিভার। নিজের চেষ্টায়ই দাঁড়িয়েছেন তিনি—একেবারে স্বনামধন্য পুরুষ।

পার্টিশানের আগে পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল ধনেশবাবুব। উদ্বাস্তু লোক —একেবারে খালি হাত পায়ে এসেছিলেন কলেজস্ট্রিটে বইয়ের দোকানে চাকরি করতে। বেতন সামান্য, চার আনা টিফিন রোজ।

বছর দু'তিন চাকরি করলেন। শিখে নিলেন বইয়ের ব্যবসা। বই ছাপা, বিক্রী, স্কুল ক্যানভাসিং, স্পেসিমেন কপি চুরি, ব্লাক এডিসন চালানো, লেখক চড়ানো এবং প্রেস ফাঁকি দেওয়া সব শিখে নিলেন উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে। তারপর দিলেন চাকরি ছেড়ে।

এবার নিজে প্রকাশক হলেন ধনেশবাবু। মূলধন কিছু নেই—নেই কোন ঘর। তবু সব সংগৃহিত হলো—আব, তা' হলো খুব সুকৌশলে।

ব্যাপারটা অনেকেই জানে। কিন্তু ধনেশবাবু স্বীকার করেন না তা—তবু, প্রিয়তোষ সব শুনেছে।

এক শ্রেণীর নতুন লেখক লেখিকা ঘুরে বেড়ান প্রায় হামেশাই কলেজস্ট্রিটের রাস্তায়। যারা কল্কে পান না কোন পত্র পত্রিকায় বা ঝানু প্রকাশকদের কাছে।

অথচ, লেখক হবার বাসনা উদগ্র—নামের মোহ উদ্দাম। পয়সা-কড়ি আছে—দরকার হলে নিজের পয়সায় বই ছাপাতেও রাজি।

এ রকম একটি লেখিকাকে আবিস্কার করলেন ধনেশবাবু। অল্প বয়সে পড়ছেন ইউনিভার্সিটিতে, দেখতেও মন্দ না। ভদ্রমহিলা উপন্যাস লিখছেন একটি। নাম দিয়েছেন "সুখের পায়রা"। পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘুরছেন ছাপানোর জন্য।

চায়ের দোকানে আলাপ হলো ওঁর সংগে ধনেশবাবুর চা খেতে খেতে। কথা বার্তায় বুঝে নিলেন ব্যাপারটা এবং টোপ ফেললেন সংগে সংগে। এক টোপেই কাজ হ'লো—বড়শিতে মাছ গাঁথ্লো।

"সুখের পায়রা" ছাপালেন ধনেশবাবু। সম্পূর্ণ মূলধন লেখিকার কিন্তু বইয়ে বা কোথাও কাগজ পত্রে উল্লেখ থাকলো না সে সব কথা।

প্রকাশক হলেন ধনেশ মুখার্জী। পোঃ আমডাগাছি, ২৪ পরগনা এই ঠিকানায়।

কলেজস্ট্রিটে বিক্রয় কেন্দ্র বা অফিস দরকার একটি। তা'ও ঠিক হয়ে গেল। ওই চা দোকানেব মালিকের সংগে বোঝাপড়া হয়ে গেল একটা। তার দোকানেই মাল রাখবেন, বেচবেন ঘুরে ঘুরে—এজন্য মাসিক তিরিশ টাকা করে দেবেন।

কিন্তু মাল রাখবার জন্য জায়গাতো চাই একটি। তাই চা দোকানের মধ্যেই দেওয়ালের গায়ে একটি আলমারি কবে নিলেন ধনেশ বাবু মাল বাখবার জন্য। তার গায়ে ছোট একটা সুন্দর টিনের প্লেট লাগিয়েও দিলেন নিজের নামে—জন্ম হলো "মুখার্জী এণ্ড কোং" এর।

ঘুরে ঘুরে বই বেচতে লাগলেন ধনেশবাবু। উত্তর দক্ষিণ ও মধ্য কোলকাতার সমস্ত বইয়ের দোকান ও ষ্টল গুলো ঘুরে বেচতে লাগলেন "সুখের পায়রা"। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েও গেল।

লেখিকা এতদিন টাকা পয়সা চাননি। তাঁর বই বিক্রী হচ্ছে এতেই তিনি বিভোর। কিন্তু প্রথম সংস্করণ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায় ধনেশবাবু যখন তার অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাতে শুরু করলেন, তখন বন্ধুদের পরামর্শে একটি বোঝাপড়ায় আসতে চাইলেন তিনি।

ধনেশবাবু বোঝালেন তাঁকে, প্রথম সংস্করণে লাভ হয়নি কিছুই। ধরতে গেলে লোকসান দিয়েই বই বিক্রী করেছি শুধু নামের জন্য—তাছাড়া কী খেটেছি আপনি তো দেখেছেন। পরের সংস্করণ ছাপছি আবার। যদি বিক্রা হয় এবারও আগের মতো তাহলে নিশ্চয়ই কিছু দেবো আপনাকে। বিশ্বাস রাখুন আমার উপরে—ঠকাবো না আপনাকে।

— আচ্ছা।

লেখিকা চুপ করে গেলেন।

দ্বিতায় সংস্করণ কিছু বেশি ছেপেছিলেন ধনেশবাবু। আসল বিক্রি করে বাড়তিটা সামনে রেখে বললেন, না, বিক্রী কই—হোক, কিছু দেবো আপনাকে।

লেখিকা ঘুরতে লাগলেন। শিক্ষিতা ধনী কন্যা হলেও তাঁর বয়স অল্প। বুদ্ধি কাঁচা।

ধনেশবাবু সুযোগ নিলেন আবার। ভদ্রমহিলা প্রেমে পড়ে গেল ওঁর। যে প্রেম ছিল সাহিত্যে তা এসে দাঁড়ালো দেহে মনে।

ধনেশবাবু মুখে বড় বড় বুলি আউড়ে তাঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন আজ এখানে কাল সেখানে। দু'জনে একটি সংসার পাতলেন ওঁরা। না বিয়ে টিয়ে কিছু হলো না।

তিন চারটে বৎসর কেটে গেল এভাবে। আরও কিছু টাকা হাতিয়ে নিলেন ধনেশবাবু প্রেমিকার কাছ থেকে। আরও দু' তিনটি বই ছেপেছেন তিনি তখন অন্য লেখকের এবং একটি ঘরও নিয়েছেন মুখার্জী কোং-এর নামে।

"সুখের পায়রার" লেখিকা বই লিখেছেন ততদিনে আর একটি। মুখার্জী কোং এ তা' ছাপা হবার কথা। কিন্তু আজ কাল করে তা' আর বেরুলো না।

এ দিকে ঘর নিয়েই স্কুল বইয়ের দিকে মন দিলেন ধনেশবাবু। দু' একটি স্কুল বই ও বেরিয়ে গেল। সেই সময় হঠাৎ জানা গেল বিয়ে

করেছেন তিনি। না, সুখের পায়রার লেখিকাকে নয় অন্য আর একটি মেয়েকে।

এখন মুখার্জী কোং-এর অনেক বই—কর্মচারী তিনটি, তাছাড়া ধনেশবাবু আজ যথার্থ ধনীও বটে। নিজস্ব দু'টি বাড়ি—ব্যাঙ্কে কিছু নগদ টাকা আর একখানা প্রাইভেট গাড়ি।

ভাগ্যবান ব্যক্তি এই ধনেশবাবু। কিন্তু তাঁর ভাগ্য বিধাতার ইচ্ছায় তৈরী হয়নি হয়েছে তার নিজের চেষ্টায়—অর্থাৎ নিজেই নিজের ভাগ্যকে গড়েছেন তিনি। হয়তো তাঁর এই সফলতার পিছনে কিছুটা অপবাদ আছে—তিনি একজনকে ঠকিয়েছেন। তবু তাঁকে ধন্যবাদ এজন্য কি অন্যায় কিছু করেছেন তিনি? আর ঠকান? হ্যাঁ, সংসারে মানুষকে না ঠকিয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে?

এই ঠকাতে সবাই পারে না। এতেও বুদ্ধি লাগে। যে ঠকায় দোষ তার নয়—দোষ তার, যে ঠকে। কারণ, তার বুদ্ধি নেই। যার বুদ্ধি নেই সে তো ঠকবেই— কথায় বলে না, বুদ্ধিং যস্য, বলং তস্য অন্যায়টা কোথায়?

মাধব যথা সময়েই চা নিয়ে এসেছিল। অর্ডার অবশ্য মালিক করেননি করেছেন ধনেশ বাবু তবু মাধব জানে এ তাঁরই আদেশেরই মতো। কারণ, ধনেশবাবুকে যথেষ্ট সমীহই করেন যদু বাবু।

চা খেতে খেতে যদুবাবুর মুখে প্রিয়তোষের গল্প শুনে উৎফুল্লই হলেন ধনেশ বাবু।

যদুবাবুকে ছেড়ে গল্পের খোদ নায়ককেই ধরলেন তিনি এবার, ও মশাই রাখুন আপনার প্রুফ দেখা এখন—দেখি, আর একটা সিগারেট দিন দেখি আগে।

প্রিয়তোষ বিরক্ত হলো। তবু মুখে প্রকাশ করার উপায় নেই। যদুবাবুর ঘরে সে বসে—তারই বন্ধু, এই ধনেশ বাবু। তা ছাড়া তাঁর কোং-এরও প্রুফ হয়।

অতএব নিজেকে সংযত করে নিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা ওঁর

দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, প্রুফটা আর্জেন্ট—কাজেই এখন কথা বলতে পারছি না, কিছু মনে করবেন না।

—রেখে দিন আপনার আর্জেন্ট—ও সব প্রুফই আর্জেন্ট। এখন বলুন দেখি আপনার ছাত্রীর কথা। ধনেশ বাবু বললেন সিগারেট টানতে টানতে।

প্রুফ্ দেখতে-দেখতে প্রিয়তোষ বলল, ছাত্রীর কথা মানে?

—ওই যাকে পড়ান আপনি।

—আমি তো শুধু ছাত্রীকেই পড়াই না, ছাত্রও তো আছে।

—ক'জন সব সমেত?

—তিনটি।

—কোন-কোন ক্লাশে?

—ছাত্রী তুটি ওয়ান্ আর ফোর, ছাত্রটি ফাইভ।

—তা' দিদি-টিদি নেই ওদের?

—কেন?

—কেন আবার জিজ্ঞেস করছেন—বলি, বিয়ে তো করলেন না, তা' এমনি কাটাবেন, একটু হাতের সুখ-টুক করবেন তো?

—মানে?

—গাছেরও খাবেন তলারও কুড়োবেন এই আর কি।

—এ কি বলছেন—

—ঠিকই বলছি, বলি, বয়সতো আর কম হলো না। এ বয়সে মেয়ে দেবে আর কেউ আপনাকে? বিয়েতো হবে না—অতএব সুযোগ যখন পেয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করে নিন, বুঝলেন?

—বুঝলাম।

প্রুফ্ দেখায় মন দিলো প্রিয়তোষ।

এমন সময় একটি খরিদ্দার ঢুকলেন সাউদার্ণে। যতুবাবু তাঁর হাত থেকে স্লিপ নিয়ে অর্ডারের পরিমাণ দেখতে উৎসুক হলেন। ধনেশ বাবু খরিদ্দারটিকে প্রশ্ন করলেন, মুখার্জী এণ্ড কোং-এর অর্ডার নেই কিছু?

—আছে।

—আচ্ছা, এখানকার বই নিয়ে আসুন আমাদের ঘরে।

ধনেশবাবু বেরিয়ে গেলেন এবার।

একধারে বসে প্রুফ্ দেখছে প্রিয়তোষ। না, কোন চেয়ার টেবিল নির্দিষ্ট নেই তার জন্য। একটি টুলের উপর বসে হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে তার উপর প্রুফ্ রেখে প্রুফ্ দেখছে সে।

গ্রন্থকেন্দ্রের প্রুফ্ এই কোম্পানীর সব প্রুফ্ই সে দেখে—নির্দিষ্ট পার্টি ওরা, পেমেণ্টও ভালো ওদের। কে জানে ঠিকমতো দেখা হলো কিনা—হয়তো ভুল থেকে গেল কিছু। থাকুক, এগুলো ফার্স্ট প্রুফ্, পরের প্রুফ্ মনোযোগ দিয়ে দেখলেই হবে একটু।

না, বসার একটা নতুন জায়গা করতে হবে এবার। কিন্তু কলেজস্ট্রীটের পাবলিশারদের ঘরে বেশির ভাগ কোম্পানীতেই স্থানের বড় অভাব। চট্ করে কেউ রাজিও হবেন না বসতে দিতে।

কাজে মন বসছে না এখন। তবু কাজ করে যাচ্ছে প্রিয়তোষ। পাঁচটার মধ্যে উঠতে হবেই—তাহলে সাড়ে পাঁচটার ট্রেন্ ধরে ছ'টার মধ্যে পৌঁছানো যাবে বালিগঞ্জে। ওধারে বসে থাকবে ছাত্র-ছাত্রীরা। এদিকে ওই সময়ের মধ্যে সেরে নিতে হবে কাজগুলো।

খুব তাড়াতাড়ি মনে মনে প্রুফ্ পড়ে যাচ্ছে প্রিয়তোষ আর কলমের সাহায্যে কেটে যাচ্ছে ভুল গুলো একটা একটা করে। প্রেসে এই সময় কাজের চাপ খুব বেশি থাকায় প্রায় সব প্রেসেই টাইপ্ শর্ট পড়ে যায়। টাইপেব স্টক্ বাড়িয়ে টাকা আটকাতে কেউ চায়না। প্রেসের মালিকরা চায় নতুন টাইপ্ বার বার না কিনে একবারের কেনা টাইপগুলোকে যতবার চালিয়ে নেওয়া যায়।

এই প্রুফ্টায় টর্ণ পড়েছে প্রচুর। অর্থাৎ যে টাইপ শর্ট পড়েছে সেখানে অন্য টাইপ উল্টে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছাপার সময় নির্দিষ্ট টাইপ অন্য ছাপা ফর্মা থেকে খুলে এখানে বসিয়ে নিলে চলবে, কম্পোজ এগিয়ে যাক। প্রেসের ভাষায় একে টর্ণ বলে।

একে ফার্স্ট প্রুফে ভুলের পরিমাণ বেশি তা'য় টর্ণ অর্থাৎ টাইপ শর্ট। কাটতে কাটতে হাত ব্যথা করে উঠছে প্রিয়তোষের।

এই শীতকালেও কপালে ঘাম দেখা দিচ্ছে। তবু যথা সম্ভব দ্রুত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সে। এর মধ্যে ওর অবচেতন মনে ধনেশ বাবুর কথাগুলো প্রতিক্রিয়া করেও যাচ্ছে আপন গতিতে।

"গাছেরও খাবেন তলারও কুড়োবেন" "একটু হাতের সুখ করবেন তো" এই কথাগুলি দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছেন ধনেশবাবু প্রিয়তোষের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। নোংরা ইংগিত করেছেন তিনি।

কিন্তু ওসব ইতরামিকে মনে আশ্রয় দিতে চায় না প্রিয়তোষ। তবু ধনেশবাবু বলতে পারলেন কি করে কথাগুলো ? না, লোকটি সত্যিই বদ—বাইরে কেমন ভদ্রের আবরণ ভিতরে ভিতরে শয়তানের গুরু।

যদুবাবু—ধনেশবাবু। দুই বন্ধু, দুই প্রকাশক, দুই পাশা-পাশি পুস্তক ব্যবসায়ী। পোশাক-পরিচ্ছদে উভয়েই ভদ্র—শিক্ষার দিক দিয়ে ওঁরা কতখানি তা' জানেনা প্রিয়তোষ। কিন্তু এরা কী ধরণের ভদ্রলোক—যাঁদের মনে এত নোংরামি, এত কদর্যতা।

যদুবাবু সম্বন্ধে দু'একটা কথা শুনলেও ধনেশবাবু সম্বন্ধে বহু কথাই তার শোনা। লম্পট-দুশ্চরিত্র-মাতাল-ধান্দাবাজ এই ধনেশবাবু। এই ধনেশবাবুর মহিমা অনেক। কলেজস্ট্রীটের বই পাড়ায় তাঁর আর একটা বিখ্যাত নামও আছে। তিনি হচ্ছেন কলির কেষ্ট।

না, উড়িয়ে দেওয়া যায় না কথাগুলোকে। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় সত্যিই তাই।

প্রায় দুপুরে ওঁর দোকানে গেলে দেখা যাবে দু' একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন ঠিকই ওঁর পাশে। ওর সংগে হাসি-হাসি ঢলা-ঢলি ইয়ার্কি-ফাজলামি করছেন তাঁরা, নয়তো গল্প করছেন। ধনেশবাবু তাঁদের সকলকে স্নেহকরে গায়ে চাপড় মেরে শাসন করছেন। কাউকে ভালবেসে সোহাগ করে জড়িয়ে ধরে বক্ বক্ করছেন।

খরিদ্দার প্রেসম্যান প্রুফ্ রীডার সবারই চোখে পড়ে এ দৃশ্যগুলো মুখার্জী কোম্পানীতে গেলে। কেউ এগুলোকে দোষের ধরে না গুণেরও বলে জাহির করে না। আসলে, পরচর্চায় উৎসাহ নেই কারো —যে যার কাজে যান, কাজ করে চলে আসেন।

অবশ্য, মুখার্জী কোম্পানীতে যাতায়াতকারী মহিলাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা পরিচয় আছে। তাঁরা কেউ শিক্ষিকা, কেউ ছাত্রী, কেউ চাকুরি সন্ধানী আবার কেউবা সমাজ সেবিকা। ধনেশবাবু ওদের সবার দাদা। ধনেশ দা না হলে চলতে পারেন না তাঁরা।

মাঝে মধ্যে পার্কে, রেস্টুরেন্টে, গঙ্গার ধারে বা মোটর গাড়িতেও অনেককে দেখা যায় ধনেশবাবুর সংগে। অথচ ধনেশবাবু সংসারী মানুষ—বিবাহিত, পুত্রকন্যার বাবা। তবু তাঁর বৃন্দাবনে সহস্র গোপিনী, সহস্র লীলা। সেজন্যই তিনি কলির কেষ্ট—কলেজস্ট্রীটের ধনকেষ্ট।

প্রিয়তোষকে শিষ্য করে নেবার সাধ অনেক দিনের তাঁর। লোকটা অবাধ্য, আত্মকেন্দ্রিক।

এতদিনেও উপযুক্ত গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেনি সে তবু ধনেশবাবু ওর মঙ্গল করতে চান এবং সুযোগ পেলেই কিছু না কিছু জ্ঞান দান করেন ওকে অকৃপণ হাতে উদার চিত্তে।

প্রিয়তোষ ভাবে এক একসময় দীক্ষা নেবে নাকি সে এই গুরুর কাছে। সত্যিইতো, বিয়ে থা সে করেনি—দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ বিড়ম্বনাময় নিঃসঙ্গ জীবন তার। সে যদি গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়, তাঁর সঙ্গ ধরে পড়ে থাকে তাহলে একটু শান্তি তো সেও পেতে পারে গুরুর প্রসাদে। ভোগের জন্য অর্থ গুরু জোগাবেন—বর্তমানের দায়িত্ব তিনি নেবেন। শুধু তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

না, প্রিয়তোষ পারেনি তা কোনদিন এবং পারবেও না। এজন্য মুখার্জী কোং-এর প্রুফ্ না পায় সে না পাবে—ভদ্রলোককে অমর্যাদা করবে সে এবার থেকে।

তেরো নম্বর স্টেশন রোডের এই সবুজ বাড়ির একটা ইতিহাস আছে। এককথায় সবুজ বাড়ি বললে এ তল্লাটের সকলেই চিনবে বাড়িটাকে।

কিন্তু চিরকাল এ বাড়ির রঙ সবুজ ছিল না। প্রথমে যখন তৈরী হয়েছিল এ বাড়িটা তখন এর সর্বাঙ্গে ছিল লাল আবরণ।

সেদিন এর নাম ছিল নম্বর ধরে। তোরো নম্বর বাড়ি বলতেই বোঝাতো বাড়িটাকে। এখন এর নাম সবুজ বাড়ি।

প্রায় বছর পঞ্চাশেক আগে তৈরি হয়েছিল বাড়িটা প্রথম। লাল রঙের দ্বিতল বাড়ি—সংগে খানিকটা বাগান। মালিক এক ইংরেজ সাহেব। বালিগঞ্জের এ অঞ্চল ছিল তখন জন বিরল এলাকা। সাহেবের পক্ষে বাগান বাড়ি তৈরির উপযুক্ত স্থানই বটে।

বছরের বেশির ভাগ সময়ই খালি পড়ে থাকতো বাড়িটা। সাহেব মাঝে মধ্যে আসতেন এখানে অবসর যাপন করতে। একজন মালি ও একটি ভৃত্য কর্তৃক রক্ষিত হতো বাড়িটা।

দেশ স্বাধীন যখন হলো সাহেব চলে গেলেন স্বদেশে। তখন বাড়িটা বিক্রী করে গেলেন তিনি এক ধনী মাড়োয়ারীকে। তিনি কিছু সংস্কার সাধন করলেন বাড়িটার। দ্বিতল থেকে ত্রিতল এবং সর্বপরে চারতলা হলো।

কিন্তু সংগের বাগান গুলি প্লটে প্লটে বিক্রী হয়ে গেল। এখন সে সব প্লটে ছোট বড় অনেক বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। ওখানে যে কোন বাগান ছিল কোনকালে দেখলে বোঝাই যাবে না।

যাই হোক বছর দশেকে গেল ক্রমে। কি কারণে কে জানে

শেষ পর্যন্ত ওই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হঠাৎ মারা যেতেই তাঁর ছেলেরা বিক্রী করে দিলো আবার বাড়িটা।

এবার এ বাড়িটির মালিক হলো দাসেরা। তাঁরা বাড়িটা কিনেই সংস্কার করলেন আবার। প্রথমেই রঙ গেল পাল্টে। লাল রঙের বদলে এর নতুন রঙ করা হলো সবুজ।

সেই থেকেই এ বাড়ির নাম হয়ে গেল সবুজ বাড়ি। এত বড় বাড়ি এ তল্লাটে ছিলই না বললে হয়। ইদানিং কালে তু'চারটি হয়েছে। সে সব বাড়ির কোন নাম নেই।

পুরাতন বলেই হোক আর অন্য কোন কারণেই হোক সবুজ বাড়ি বললে বালিগঞ্জের এ পাড়ার কারোরই চিনতে আর অসুবিধে হয় না এখন একে।

এই সবুজ বাড়ির বর্তমান মালিক দাসেরা শহরের লোক নন। তাঁরা এসেছেন মফঃস্বল থেকে। মেদিনীপুর জেলার এক গণ্ড গ্রামে তাদের বাড়ি। বহু জনশ্রুতি আছে দাসেদের নামে। শোনা যায় তাঁরা নাকি খুব ডাকসাইটে জমিদার—বহু টাকার মালিক।

কিন্তু প্রিয়তোষ জানতো সব সঠিক ঘটনা। অনিলবাবুর সংগে আলাপ ওর অনেক দিনের। এককালে তাঁর ছেলেকে সে পড়াতো —সেই সুবাদেই সব শুনেছে।

না, বনেদী বংশ নয় এই দাসেদের। এক পুরুষের ধনী এরা, এক পুরুষের জমিদার।

এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা জমিদার নিকুঞ্জ দাসের পিতা ছিলেন একজন সাধারণ ব্যক্তি। তাঁদের পূর্বপুরুষের পেশা ছিল মাছ ধরা—নদী ও সমুদ্রে মাছ ধরে তা' বিক্রি করে কোন রকমে দিন গুজরান করতেন তিনি।

জন্মগত ধংশগত পেশা হিসাবে নিকুঞ্জদাসও কৈশোর বয়সে থেকে বাপের সংগে সংগে নদী ও সমুদ্রে মাছ ধরে ধরে বেড়াতেন। বরাবরই তিনি ছিলেন তুঃসাহসী। জলে জলে ঘুরে বেড়াতেই নাকি ভালো লাগতো তাঁর।

শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষ এই নিকুঞ্জদাস। লম্বা চওড়া দশাশই চেহারা। বাপের একমাত্র ছেলে সে। কাজেই, সতেরো-আঠারো বছর বয়সেই তাকে বিয়ে-থা' দিয়ে ঘর-সংসারি সাজাবার সাধ হলো বাপের। মেয়ে খুঁজতে লাগলেন তিনি। কিন্তু নিকুঞ্জদাস বেঁকে বসলেন—সংসাব তিনি করবেন না এখন। মা' ও বাপের পক্ষে অতএব সাধা-সাধি চলল। তবু নিকুঞ্জর সংকল্প বদলালো না।

বাপও কম নন। ছেলের কাছে হাবতে তিনি রাজি নন। মেয়ে দেখা চলতে লাগলো। নগদ এককুড়ি টাকা পণ দিয়ে পাওয়াও গেল একটি পাত্রী যথাসময়ে। ওকেই বিযে কবতে হবে নিকুঞ্জকে বলে ফতোয়া জারি করে বসলেন একদিন।

এদিকে ছেলের ধনুকভাঙা পণ। বিবাদ বাধলো পিতা পুত্রে। অবশেষে পাড়া পড়সির বলাবলিতে নরম হতে হলো নিকুঞ্জকে। বাবা গুরুজন তিনি স্বর্গ তিনিই ধর্ম, তিনি পরম তপস্যার বস্তু। অতএব তাঁর অবাধ্য হতে নেই। অশিক্ষিত নিরক্ষর সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মের দোহাই বড় দোহাই।

সুতরাং সম্মত হলো নিকুঞ্জ এবং বিয়ে তাঁর হলো ওই বয়েসেই ওই পাত্রীর সংগে।

দেখতে শুনতে সুন্দরী নয় দুর্গামণি। রং কালো—রোগা রোগা চেহারা। তবু ওঁদের মাছ মারা সমাজে অনেক দাম ওর। কারণ তার বাবা গ্রামের মোড়ল। তার মেয়েকে আনা সৌভাগ্যের ব্যাপার বৈকি।

নির্বিবাদে বিয়ে হয়ে গেল নিকুঞ্জ দাসের। কিন্তু সংসারী তিনি হলেন না। সংসারে মন তাঁর আগেই ছিল না আর এখন বাপের কাছে পরাজিত হয়ে ভিতরে একটা চাপা আক্রোশ পোড়াতে লাগল তাঁকে। সেবার দলের সংগে সমুদ্রে মাছ ধরতে দু'তিন মাসের জন্য বেড়িয়ে পড়তে মন ঠিক করে ফেললেন তিনি হঠাৎ।

সবে মাত্র তিন চার মাস হয়েছে বিয়ে হয়েছে তাঁর। বিয়ের পর সোমত্থ বউ রেখে মাছ ধরতে বাপ সায় দিলেন না তাকে।

নিকুঞ্জ তবু জেদা জেদি শুরু করল। যাত্রার দিন সকালে বাপ বাধ্য হয়ে ঘরে তালা বন্ধ করে রাখলেন ছেলেকে সকাল থেকে।

শুধু তাই নয়, দোর গোড়ায় পাহাড়াও রইলেন তিনি স্বয়ং—কেউ গেট খুলে দিতে না পারে।

সারাদিন ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন নিকুঞ্জ দাস। ছোট মাটির ঘর, খড়ের চাল। দরজাটা অবশ্য কাঠের—বাইরে থেকে শিকলে তালা আঁটা।

বেরোবার উপায় নেই। ওঁর ভাত জল ঘরেব মধ্যে দিয়েই যাওয়া হয়েছে। কিন্তু সারাদিন কিছু স্পর্শই করেন নি তিনি। জীবনের কাছে এমনি পরাজয় মানতে তিনি নারাজ—কালের চক্রান্তের কাছে নতি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত।

ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এলো। সাগরযাত্রী মাছ মারার দল রওনা হয়ে গেল। ঘরে বসে তাদের যাত্রার সোর গোল কানে এলো নিকুঞ্জ দাসের। মরিয়া হয়ে উঠলেন তিনি গৃহত্যাগের জন্য। হ্যাঁ, উপায়ও বার করলেন একটা।

এক সময় যেমন করেই হোক চালের ওপর উঠলেন তিনি ভিতর দিকে। ধীরে-ধীরে সরিয়ে ফেললেন কিছুটা খড়। তারপর গায়ের শক্তি দিয়ে বাঁশের বাতা ভেঙে ফেললেন দু'তিনটি।

না আর বাধা নেই। বাইরে বেরিয়ে গাছ বেয়ে ঘরের পিছন দিকে বাগানের মধ্যে নেমে পড়লেন তিনি।

অন্ধকার রাত। বাগানের পরেই খোলা মাঠ। অদূরে নদী। না আর দাঁড়ালেন না নিকুঞ্জ দাস। কোন দিকে না তাকিয়েই ছুটলেন তিনি নদীর দিকে। তাঁর বাবা নিশ্চয় এতক্ষণে দরজার সামনে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ছেন। গ্রামও নীরব। আর, এই তো সুযোগ।

ঠাকুরদার আমলের বত্রিশ হাত বাছারি নৌকাখানা নদীর ধারে একটি বট গাছের শিকড়ের সংগে বাঁধা ছিল শক্ত কাঁসের সাহায্যে। এতে করে বাপের সংঙ্গে কতদিন মাছ ধরে বেড়িয়েছেন নিকুঞ্জ দাস।

তিনি নিজেও একজন পাকা মাঝি হয়েছেন এ' কবছরে বাপের সংগে ঘুরে ঘুরে।

নৌকা খুলে দিলেন হঠাৎ নিকুঞ্জ দাস। শক্ত হাতে চেপে ধরলেন বৈঠাখানা। তারপর—ভাসলেন তিনি অকূলে। হ্যাঁ রাতের মধ্যেই পেরিয়ে যেতে হবে গ্রামগুলো। তা হলে আর চেনা জানা কারো সংঙ্গে দেখা হবার ভয় নেই।

নিকুঞ্জ দাস ভাসলেন।

জল আর জল। চারিদিকে শুধু জল। এ পাড়ে মেদিনীপুর ও পাড়ে চব্বিশ পরগনা। মাঝে বিরাট চওড়া হুগলী নদী। সামনেই অকূল সাগর—বঙ্গোপসাগর।

কোন দিকে যাবেন ঠিক করতে পারলেন না নিকুঞ্জ। সাগরে মাছ মারার দলকে ধরতে পারবেন কি তিনি এখন? কে জানে কতদূর চলে গেছে তারা—তাছাড়া যদি তাঁদের ধরা না যায় তা হলে কি করবেন তিনি গঙ্গা সাগরে গিয়ে? সংগে খাদ্য পানীয় কিছুই নেই। দলের সংগে মিলতে না পারলে বেঘোরে প্রাণটাই যাবে।

ভেবে চিন্তে পুবমুখেই ঘুরিয়ে দিলেন নৌকার মাথাটা নিকুঞ্জ। বহুদূরে ডায়মণ্ডহারবার শহরের আলো। নদীতে এখানে টান খুব।

সাবধানে শক্তহাতে বৈঠা চেপে মারতে লাগলেন নিকুঞ্জ। দুপুরের পর থেকে খাওয়া হয়নি কিছুই এখনও। এমন কি এক গ্রাস জল পর্যন্ত পান করেননি তিনি জেদ করে। এখন মধ্যরাত্রি। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর দেহখানি।

অনেক খানি পথ অতিক্রম করে এসেছেন নিকুঞ্জ। না, মন চাইলেও বাড়ির দিকে ফেরার উপায় এখন নাই। সামনেই এগোতে হবে নচেৎ অবধারিত মৃত্যু। প্রাণপণ শক্তিতে নৌকা বাইতে লাগলেন তিনি।

প্রায় ভোরের দিকে এসে পৌঁছালেন ডায়মণ্ডহারবার উপকূলে। একটা গাছের সংগে নৌকোটাকে বেঁধে রেখে উপরে উঠলেন টলতে টলতে।

জল চাই—জল। পিপাসাতে ব্রহ্মতালুটা ঝিম-ঝিম করছে, কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ।

বরাত ভালোই জানতে হবে ওঁর। কিনারা ছাড়িয়ে একটু ভিতর দিকে আসতেই একটা জলাশয় পাওয়া গেল শহরের মধ্যে। ছুটে গিয়ে আজলা ভরে জল পান করলেন নিকুঞ্জ। তারপর ক্লান্তি দূর করতে কাঁধের গামছাটা পেতে শুয়ে পড়লেন ওই জলাশয়ের পাড়েই। দু'চোখ বুঁজে এল মুহূর্তেই।

কতক্ষণ কেটে গেল উনি জানেন না। চোখে রোদের পরশ লেগে ঘুম ভেঙে গেল একসময়। হ্যাঁ, অনেক বেলা হয়ে গেছে বৃক্ষতলে শুয়ে। রদ্দুরটা অনেক দেরিতেই পৌঁচেছে এখানে।

ঘুম থেকে উঠেই চিন্তায় পড়লেন নিকুঞ্জ। বাড়ির কথা মনে পড়লো। তাঁর মনে পড়লো দুর্গামণির কচি মুখখানি। কেন তিনি চলে এলেন এভাবে সবাইকে ছেড়ে? বাপ সাগরে যেতে দেয়নি তাতে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে আসে এমনি? কিন্তু উনি এসেছেন—আর এসেছেন যখন তখন বাড়িও ফিরবেন না উনি চট করে।

উঠে পড়লেন এবার নিকুঞ্জ। পায়ে পায়ে নদীর ধারে এলেন একবার। হ্যাঁ, নৌকাটা বাঁধাই আছে ঠিক। থাক, নিকুঞ্জ চললেন আবার শহরের দিকে।

এ শহরে ইতিপূর্বে দু' একবার আসা-যাওয়া ছিল তাঁর। ওদের গ্রামের একটি ছেলে থাকে এখানে। হ্যাঁ, অনন্তর সংগে খুব ছোটবেলা থেকেই খেলাধূলা করে বড় হয়েছেন তিনি। অনন্ত ভালোও বাসে খুব ওঁকে।

একটি খাবারের দোকানে কাজ করে অনন্ত এখানে। খুঁজে খুঁজে সেই দোকানে এলেন এবার নিকুঞ্জ। অনন্ত ওঁকে দেখেই অবাক। বলল, কিরে এলি কি করে!

—সে কথা পরে—আগে কিছু খেতে দে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।

—সে কি, আয়—আয়! দোকানের ভিতরে মাচার উপরে নিয়ে এলো ওঁকে। বলল, কিরে এলি কি করে?

—সে কথা পরে—আগে কিছু খেতে দে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেচি। পুনরায় বলল নিকুঞ্জ।

ওখানেই ওর ডেবা। বসতে দিয়ে দোকান থেকে কিছু নিমকি সিঙ্গাড়া ও জিলিপি এনে খেতে দিল ওঁকে।

কিন্তু তাতে ক্ষুধার নিবৃত্তি হলো না নিকুঞ্জর। একসের চালের ভাত ধরে যে পেটে সেখানে কী করবে ওই কটা সিঙ্গাড়া-নিমকি আব জিলিপি?

বাধ্য হয়ে কিছু চিঁড়ে কিনে আনতে হলো এবার অনন্তকে। ভোজন পর্ব সমাধা করলেন নিকুঞ্জ।

দেহটা সতেজ হয়ে উঠেছে আবার। আস্তে আস্তে বলল অনন্ত, কি করবি এবার—ফিরে যাবি, না এদিকে কাজকর্ম কববি কিছু?

—দূর, এখানে থাকবো নাকি আমি।

—তবে?

—সে তোকে ভাবতে হবে না—তুই বরং এক কাজ কর।

—কি?

—একটা টাকা জোগাড় করে দে আমায়।

—কেন?

—দরকার আছে।

মাসিক দু'টাকা মাইনে অনন্তর। মালিকের কাছে বলে তার থেকে এক টাকা অগ্রিম নিয়ে বন্ধুকে দিলো সে।

নিকুঞ্জ বেরোলেন। বাজারে এসে চিঁড়ে গুড় আর একটি বড় মাটির কলসী কিনলেন তিনি। তারপর চিঁড়ে গুড় গামছায় বেঁধে কলসীতে এক কলসী পানীয় জল নিয়ে নৌকায় এসে উঠলেন

আবার। কিছু না ভেবেই নৌকো খুলে দিলেন। না, বাড়ির দিকে নয়, পূর্ব মুখে।

দুই দিন দুই রাত কেটে গেল এরপরে। এ নদী সে নদীতে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত সেদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গোসাবা শহরে এসে পৌঁছলেন নিকুঞ্জ। অনন্তর কাছ থেকে সংগৃহিত রসদ শেষ হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

এবার কি করবেন ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। না, এদিকে জানা-শোনা নেই কেউ তাঁর—তাছাড়া, বাড়ি থেকে অনেক দূরেই এসে পড়েছেন তিনি এবার সত্যিই।

নদীর পাড়েই বাজার। বেশ বড়। চারিদিকে দোকান পসারের সারি। একটি খাবার দোকানের বারান্দায় শুয়ে সে রাতটা কাটলো নিকুঞ্জর।

সারারাত ভেবে ঠিক করলেন এখানেই থাকবেন। পরদিন ভোর থেকে তাই কাজকর্মের সন্ধানে লেগে গেলেন নিকুঞ্জ। প্রথম দিনেই কাজ জুটে গেল। গোসাবা একটি বড় গঞ্জ। ব্যবসার বিরাট একটি কেন্দ্রেও বটে—কাজের অভাব কি।

শহরের রাইস্ মিলের ধানের বস্তা উঠছে নৌকো থেকে হাজার হাজার—দুই পয়সা বস্তা প্রতি। এই কাজেই লেগে গেলেন তিনি।

সারাদিন খেটে এক টাকা সাড়ে তিন আনা আয় হলো নিকুঞ্জর। হোটেলে দুবেলা খেয়ে আর পান বিড়ি খরচ করেও পাঁচ পয়সা জমলো। দেখে আশ্বস্ত হলেন তিনি। বিদেশ বিভূঁয়ে এসেছেন যখন পালিয়ে নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতেই হবে তাঁকে।

একটা সপ্তাহ কেটে গেল দেখতে দেখতে। মিলের কুলিদের সর্দারের সংগে বেশ ভাব জমে উঠলো হঠাৎ। আর এ দোকান

ও দোকানের বারান্দায় শোবার দরকার নেই। রাইস্ মিলের সর্দারের কোয়ার্টারের একটি ঘরে থাকবার স্থান নির্দিষ্ট হলো তাঁর। ওই ঘরেই রইলেন তিনি এখন থেকে।

ক্রমে একমাস অতিবাহিত হয়ে গেল। সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনির পর নিজের ঘরে শুয়ে নিকুঞ্জ ভাবতে লাগলেন বাড়ির কথা, বাবা-মা ও দুর্গামণির কথা। না, বড় হতে হবে জীবনে। গায়ে গতরে খেটে শুধু নিজের পেটটা চালালেই হবে না।

নৌকোটা নদীর ঘাটে একটি চড়ার উপর পড়ে থাকতো। ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত একদিন ওটা বেচেই দিলেন নিকুঞ্জ এক জেলেকে। নগদ একশো টাকা এলো হাতে। উনি ঠিক করলেন এবার একটা ব্যবসা করার—কিন্তু এই মূলধনে কি এমন ব্যবসা করা চলে যাতে সত্যিই বড় হওয়া যায়?

যেই কথা সেই কাজ। ব্যবসা করার জন্য কুলিগিরি ছেড়ে দু'দিন শুধু শহরে ঘুরে ঘুরেই কাটালেন নিকুঞ্জ। এর মধ্যে আলাপ হয়েছে অনেকের সংগে ওঁর—দু'চার জন বন্ধু আর পরামর্শ দাতাও জুটেছে এখানে। সবার সংগে আলোচনাও চলল।

কেউ বলল মুদি দোকান করো—কেউ বা পান-বিড়ি-চায়ের দোকান করবার পরামর্শও দিলো। মনোঃপূত হলো না কথাগুলো।

জেলের ছেলে নিকুঞ্জ। জলের সংগে পরিচয় তাঁর ছোট বেলা থেকে—জন্ম থেকেই মাছের সংগে বন্ধুত্ব। অতএব, শেষপর্যন্ত মাছের পাইকারি ব্যবসাই শুরু করলেন তিনি।

নদীতে সাগরে মাছ ধরে যে মৎস্যজীবীর দল তাদের অনেককেই দাদন দিয়ে দিলেন তিনি।

ঠিক হলো ওরা নদীতে যে সব মাছ ধরবে তা সন্ধ্যায় এনে তুলে দেবে নিকুঞ্জর হাতে। উনি তা থেকে কিছু দাদন শোধ নেবেন বাকিটার দাম দেবেন—দরকার হলে আবার দাদন পাবে জেলেরা। দশ-বারোটা মাছমারাকে কিনে নিলেন এইভাবে নিকুঞ্জ। শুরু হয়ে গেল তাঁর ব্যবসা।

এ দিকে মাছের আমদানী প্রচুর। কাজেই, অল্প দিনের মধ্যেই জমে গেল নিকুঞ্জর ব্যবসা। তাঁর আড়তে সন্ধ্যেবেলায় যে সব মাছ আসতো সংগে-সংগেই বিক্রী হয়ে যেতো তা।

এই শহরের কয়েক মাইল উত্তরে বড় শহর ক্যানিং। সেখান থেকে রেল লাইন আছে কোলকাতা পর্যন্ত। ওই ক্যানিং-এর ব্যবসায়ীরা নৌকো নিয়ে চলে আসতো এখানে সন্ধ্যায় মাছ কিনতে। তারপর রাতারাতি ফিরে যেতো আবার তাদের শহরে। কোলকাতার ফড়েদের মাল বেচতে। লেন-দেন সব নগদ পয়সায়।

নিকুঞ্জর আগে এখানে আর কোন পাইকারী মৎস্য ব্যবসায়ী বা আড়তদার কেউ ছিল না।

এখানকার জেলেরা ক্যানিং-এর ব্যবসায়ীদের কাছেই মাছ বেচতো। নিকুঞ্জ আড়ত করবার পর সকলেই প্রায় তাঁর আড়তে জুটলো। ক্যানিং-এর বাজারেও গোসাবার নিকুঞ্জদাসের নাম ছড়িয়ে পড়লো একজন ব্যবসায়ী হিসেবে।

নিকুঞ্জর এর পরের ইতিহাস আরো দীর্ঘ। ভাগ্য দেবী যেন নিজের প্রসাদ বিতরণের জন্যই বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে এসেছিলেন এই গোসাবায় ওঁকে। একটি সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া নিতান্ত মানুষ যে সত্যিই একজন বিরাট ও স্বনামধন্য হতে পারে নিকুঞ্জই হয়তো একমাত্র তার দৃষ্টান্ত।

ওই মাছের ব্যবসা করেই দু'এক বছরের মধ্যে বেশ কিছু পয়সা হলো নিকুঞ্জর। এদিকে দু'চার বিঘে ধান জমিও করে ফেললেন তিনি। আর সেই সংগে ছোট খাটো একটি মাটির বাড়ি।

এই দু'তিন বছর এক বারও দেশে যাননি তিনি। এমন কি বাড়ির কোন খবরও রাখেন নি। এখন অবস্থা একটু ভালো হওয়ায়

এবং নিজের ভবিষ্যত পথে আলো দেখতে পেয়ে খুশি মনে একদিন বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন তিনি।

ওঁর বাবা-মা ওকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। দুর্গা মণিকে তাঁর বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন। খবর দিয়ে তাঁকে ও আনানো হলো সংগে সংগে।

সব শুনে বাবা মা অবাক। অনেক কান্না-কাটির পর নিকুঞ্জ বোঝালেন তাদের তাঁর অবস্থার কথা। সবাইকে নিয়ে কালই চলে যেতে চান তিনি গোসাবায়। ওখানে গেলে আর কারো ভাত-কাপড়ের কষ্ট পেতে হবে না।

বাবা-মা পৈতৃক ভিটে ছেড়ে আসতে রাজি হলেন না, বাধ্য হয়ে দুর্গামণিকে নিয়ে গোসাবায় ফিরে এলেন নিকুঞ্জ। ঘর সংসার পাতলেন এখানে।

অবশ্য নিয়মিত টাকা পাঠাতে লাগলেন তিনি মাসে মাসে লোক মারফত বাবা মাকে। তাঁদের আশীর্বাদে শেষ পর্যন্ত অসাধ্য সাধন করে ফেললেন নিকুঞ্জ।

ঘটনাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। মাছের ব্যবসা করতে-করতেই সুযোগ এলো।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এ এলাকাটা লোনা জায়গা। লবণ জলের নদী আর জঙ্গল চারিদিকে। সমুদ্র উপকূল থেকে বেশ কয়েক মাইল চলে এসেছে জঙ্গল ভিতরের দিকে। এবড়ো-খেবড়ো জমি। মাঝখান দিয়ে একে বেঁকে চলে গেছে ছোট বড় নদী খানা আর বিল।

মোটামুটি কিছুটা পরিমাণ জমিকে বাঁধ দিয়ে ঘিরে নোনা জলের হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে। জেলা শাসক থেকে ওই জমি বিলি করা হবে বিঘা প্রতি একটাকা নিরিখে।

যদিও এ জমি চাষের উপযোগী নয় তবুও চেষ্টা করলে জঙ্গল 'পরিস্কার করে একে চাষপোযোগী করা যায় কয়েক বছরের চেষ্টায়। এতে দেশে খাদ্যের পরিমাণও বাড়ে দেশবাসিরও উন্নতি হয়।

শোনা যায় সারাদিন বাঁধের উপর দিয়ে দৌড়ে যতটা স্থান ঘুরতে

পারলেন নিকুঞ্জ ততখানিই বন্দোবস্ত দেওয়া হল তাঁকে। নগদ দু'হাজার টাকা জমা দিয়ে দু'হাজার বিঘে জমির মালিক হলেন নিকুঞ্জ একদিনেই।

করিৎ কর্মা উদ্যোগী পরিশ্রমী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ এই নিকুঞ্জ। তাঁর এই দুঃসাহসের জন্য অনেকেই নিরুৎসাহ করে দিলো ওঁকে, কাজটা ভালো করলে না নিকুঞ্জ—টাকাটা এক বারে জলে ফেলে দিলে হে!

—কেন?

—অতগুলো নগদটাকা খরচ করে জমি নিলে লাভ কী হলো তোমার—ও জমি চাষ হবে তোমার?

—এখন হবে না বটে তবে কয়েকটা বর্ষা কেটে গেলে তারপর তো হবে ঠিক।

—সে এখন ক'টা বর্ষা লাগবে ও জমির লোনা ধুয়ে যেতে তা তুমি জানো না—ঝক্কি নিলে কেন?

—নিলাম মন চাইলো।

—মন চাইলো বলে টাকাটা জলে ফেলে দেবে?

—দোবো। জল থেকেই টাকা এসেছে আমার সে টাকা না হয় জলেই দিলাম। ভাগ্য আমাকে দিয়েছে আবাব সে যদি নেয় কী করা যাবে?

চুপ করে গেল সবাই। কিন্তু চুপ করে রইলেন না নিকুঞ্জ। যেখানে যেখানে খানা ছিল মুখ কেটে ভাটায় ভাটায় ভিতরের জল সব বার করে দিলেন নদীতে। আবার জোয়ারের আগেই মুখ গুলো বন্ধ করে দিলেন। আরও কিছু টাকা খরচ হলো এতে। বলতে গেলে হাত খালিই হয়ে গেল। তবু দমলেন না উনি।

বর্ষা এলো। কারোর সংগে পবামর্শ না করে কয়েক মণ ধান কিনে ছড়িয়ে দিলেন নিকুঞ্জ তাঁর জঙ্গল পূর্ণ অ-কৃষি করা জমিতেই। পৌষ মাসে দেখা গেল ওই কয়েক মণ ধান কয়েক শত মণ হয়ে ফিরে এলো ঘরে।

পরের বছর আবার চার হাজার বিঘে জমি নিলেন নিকুঞ্জ। এবার সব জমিরই কিছু কিছু জঙ্গল পরিস্কারও করলেন আর যেখানে যেখানে লাঙল চালানো সম্ভব হলো সেখানে সেখানে চাষ ও দিলেন। এ বৎসর ফসল হলো আশাতীত।

জলে জল বাঁধে—টাকায় টাকা হয়। এই টাকা যখন আসে তখন ছাদ ফুঁড়েই হয়তো ঘরের মধ্যে টাকার বৃষ্টি পড়ে আকাশ থেকে। হ্যাঁ নিকুঞ্জর তাই হলো। কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ কয়েক হাজার বিঘে জমির মালিক হলেন নিকুঞ্জ। না অনন্তকেও ভোলেন নি তিনি। সে এখন ওঁর ম্যানেজার।

এখন তিনি জমিদার। বহু তাঁর কর্মচারি লোকজন। দেশ থেকে জ্ঞাতি-গুষ্টি পাড়া-পড়শি আত্মীয়-স্বজন যাকেই পেয়েছেন এনে বসিয়েছেন নিজের জমিতে। সবাই ওঁর প্রজা।

নিকুঞ্জর এখন নিজস্ব কাছারি বাড়ি তিন খানা—একশোর মতো নায়েব-গোমস্তা দারোয়ান-পেয়াদা আর লাঠিয়াল। এ ছাড়া অনুগৃহিত ও আশ্রিতের সংখ্যাও কম নয়।

বছর চল্লিশেক জমিদারি করেছেন নিকুঞ্জ। লেখাপড়া তিনি না জানলেও হিসেবে তিনি পাকা, আর দুর্দান্ত প্রতাপশালী।

শোনা যায় নিকুঞ্জর নাকি উপপত্নীই ছিল কুড়ি খানেক। নিজে নাকি দুধ দিয়ে পা ধুতেন তিনি। তাঁর গোয়ালে নাকি গাই গরু ছিল এক হাজার।

এ দিকে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল হঠাৎ। থানা, পুলিশ জজ-ম্যাজিট্রেট্ সবই ছিল নিকুঞ্জের হাতের লোক সে আমলে। একালে যেন সব কেমন হয়ে যাচ্ছে। আজকাল নাকি আইন কানুনও বদলে যাচ্ছে।

এ ছাড়া আরও শুনেছিলেন শীগগিরেই নাকি জমিদারী সরকার

সব নিয়ে নেবেন। এ ছাড়া আয়কর-টর আরও কত কি হয়েছে—শুধু শুধু অনেকগুলো টাকা সরকারকে এমনি এমনি দিয়ে দিতে হবে বছরে বছরে।

এতকাল গ্রামে পড়ে থাকলেও শহরের সংগে যোগাযোগ ছিল নিকুঞ্জর।

কোলকাতায় একখানা বাড়িও কেনা ছিল। এবার কিছু কিছু জমি বেনামা করে নিলেন তিনি কর্মচারিদের নামে। আর কিছু কিছু বিক্রী করে খাজনা সেলামী ও মূল্য হিসেবে মোটা মোটা নগদ টাকা তুলতে লাগলেন ঘরে।

ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে পক্ষপাতি নন কোনদিনই নিকুঞ্জ। জমিদারি ছেড়ে না হয় পুঁজিপতি হয়ে উঠবেন তিনি। তিন চার বছরের মধ্যে তাঁর কুড়ি হাজার বিঘের সম্পত্তি এক হাজারে নেমে এল আর ও দিকে শহরে তার বিরাট বিরাট বাড়ি কেনা হলো চার পাঁচখানা। ছ'খানা বাস তিনখানা লরী, গোটা তিনেক সিনেমা হল, খান পাঁচেক মোটর লঞ্চ ও ছেলেদের বেড়াবার জন্য চারখানা মোটর গাড়ি।

কিছু টাকা রইলো হাতে। বাধ্য হয়ে নিজের স্ত্রীর নামে ছ'ভাগ করে এ টাকা ব্যাঙ্কে রাখলেন তিনি। কিছু সুদ ও আসতে লাগল হাতে।

লেখাপড়া না জেনেও শুধুমাত্র বুদ্ধি আর পরিশ্রম দ্বারা একটি মানুষ একটি জীবনে যে এত অর্থ এত সম্পত্তি ও এত বিত্ত অর্জন করতে পারে নিকুঞ্জর কাহিনী না শুনলে বুঝি বিশ্বাসই করা যায় না। লক্ষ্মী যাঁদের কৃপা করেন সরস্বতীর সংগে তাঁদের পরিচয় না থাকলেও বুঝি কিছু আসে যায় না—অন্তত নিকুঞ্জকে দেখে তাই-ই মনে হয়।

নিকুঞ্জ আজ আর নেই। বছর তিনেক হলো মারা গেছেন তিনি। তাঁর পুত্রসংখ্যা কটি সঠিক কেউ বলতে পারে না। তবে বৈধ সন্তান অর্থাৎ দুর্গামণির পেটে যারা হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা চার। প্রত্যেকেই পুত্র। এঁরা যথাক্রমে বড়বাবু, মেজবাবু, সেজবাবু ও ছোটবাবু নামে পরিচিত।

ছোটবেলা থেকেই বাপের সংগে সংগে সাহায্যকারী হিসেবে থাকায় ছেলেদের লেখাপড়া বড় একটা হয়নি কারো। নিজের জমিদারীতে গোটা তিনেক ফ্রি-প্রাইমারী স্কুলও ছিল নিকুঞ্জর।

ওই স্কুলের গণ্ডির মধ্যেই রয়ে গেছেন বড মেজ ও সেজ। শুধু ছোট বাবুকেই ভর্তি করানো হয়েছিল গোসাবার স্কুলে। তিনি ঘষে-মেজে বেশ কয়েক বছরের চেষ্টায় অষ্টম শ্রেণীতে এসে থেমেছেন। বিয়ে তাঁর আগেই হয়েছিল—কাজেই, আর এগোনো বুদ্ধিমানীর কাজ বলে তিনিও মনে করলেন না।

খুঁজে খুঁজে সুন্দরী সুন্দরী বউ এনেছিলেন নিকুঞ্জ ছেলেদের জন্য। এর মধ্যে ছোট বউমা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা। কাঁচা সোনা গলানো দেহের বর্ণ, পাথর খোদা টিকোল নাক-চোখ-মুখ। সেই ছোট বউমার ছেলে মেয়ে তিনটি। একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে।

প্রিয়তোষ ওদেরই গৃহ শিক্ষক।

চাঁদেরও কলঙ্কের মতো একটু বুদ্ধি বা শিক্ষার অভাব ছিল নিকুঞ্জর —যা কিনা তাঁর চরিত্রে কেউ আশা করেন নি। তা'হলো এই যে তাঁর মৃত্যুর পর তার এই বিশাল ঐশ্বর্যের বাঁটোয়ারা ছেলেদের মধ্যে কী ভাবে হবে সেই ব্যবস্থাটাই করে যাননি তিনি।

ছেলেরা সকলেই যে যার কর্মকেন্দ্রে থাকলেও বালিগঞ্জের সবুজ বাড়িতেই ছিল সবার একত্রিত যৌথ সংসার।

বাপের মৃত্যুর এক বছর আগে থেকেই চার বউ এসে মিলিত হয়েছিল এখানে সব ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। কোন গোলমাল বাদ-বিসম্বাদ ছিল না কোথাও। অতিথি-অভ্যাগত লোকজন আর নিজ নিজ পরিবাব নিযে সবুজবাডি ছিল সবগবম—পাড়ার আলোচ্য বিষয়।

অথচ, এক বছর যেতে না যেতেই ভাই ভাই বাঁধলো। মামলা-মোকর্দমা মাবামাবি না হলেও ভিতবে ভিতরে মিলনের সেতুটি যেন ভেঙেই গেল আচমকা।

এখন চাব ভাইয়েব হাঁড়িই আলাদা। তিন ভাই এই সবুজ বাড়িতে আছে—বড়, মেজ আব ছোট। সেজ ভাই চলে গেছে শ্যামবাজারের বাড়িতে।

বাড়ি-গাড়ি বিষয় সম্পত্তি সিনেমা হলগুলি ভাগও হয়ে গেছে মুখে মুখে ভাইদের মধ্যে আপোষে ও কর্মচারি আর আত্মীয় স্বজন ইত্যাদিদের মধ্যস্থতায়। কেউ ঠকেছেন, কেউ জিতেছেন—কেউ কম বেশি ও পেয়েছেন।

ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছায় হোক সবাই চুপ করে গেছেন এবং মেনেও নিয়েছেন সে ভাগকে।

অবশ্য, গাড়ি এখন আর কারো নেই। নিকুঞ্জ গত হবার পর দু'এক বছরের মধ্যেই ওগুলো হারিয়েছে ছেলেরা কেউ ব্যক্তিগত দেনার দায়ে কেউ বা আবশ্যকীয় খরচ হিসেবে।

কিন্তু গণ্ডগোল বেঁধেছে এই সবুজ বাড়ি নিয়ে। এ বাড়িতে এককালে কর্তা স্বয়ং বাস করতেন—এর মূল্যও অনেক। এখন এ বাড়ির মালিক কে হবেন?

চার ভাইয়ের ভাগে চারটি বাড়ি পড়লেও এটা বাড়তি।. এক সেজ বাবু ছাড়া অন্য তিনজনেই চাইছেন এর অধিকার। নিজের অংশ ছেড়ে দেবার জন্য একে অপরকে টাকার অংশও জানাচ্ছেন। ঠিক

মিটমাট হচ্ছে না। কাজেই তিন ভাই আছেন এখনও এখানে।

চারতলার একতলায় সব আশ্রিত ও অনুগৃহিতরা আছে সেই কর্তার আমল থেকেই। আর দ্বিতলে বড় তরফ থাকায় ত্রিতলেই ছোট ও মেজ তরফকে থাকতে হয়েছে মোট সাতখানি ঘরকে দু'ভাগ করে নিয়ে। মেজ তরফে চারখানি ঘর আর ছোট তরফে তিনখানি ঘর এই তলায়। একই কল পায়খানা আর বাথরুম ওদের দু'ভাইয়ের।

চারতলাটায় ঘর কম। একটি বড় হল ঘব খাবার জন্য আর একটি ভাঁড়ার ঘর ও আর একটি ঘর রান্নার জন্য। দ্বিতলের সাতখানি ঘর বসবাসের জন্য লাগায় সম্পূর্ণ ই রান্নার জন্য দখল করে আছেন বড় তরফ। সংসার তাঁরই বড়—পাঁচ ছেলে এক মেয়ে।

শোনা যাচ্ছে ছোট তরফ আর মেজ তরফ নাকি শীগগিরেই উঠে যাবেন তাঁদের নিজ নিজ বাড়িতে কালীঘাটে ও ভবানীপুরে। ওঁদের বাড়িগুলি পাঁচতলা করে এবং প্রতি বাড়িতে কুড়িটি করে ফ্ল্যাট। সে গুলির বেশির ভাগই ভাড়াটিয়ায় পূর্ণ হলেও খালিও আছে দু'একটি। তবে কি টাকার জন্যই বসে আছেন ওঁরা এখনও এ বাড়িতে? কিন্তু বড় তরফ কী ভাবছেন?

দেখতে-দেখতে একটি সপ্তাহ কেটে গেল প্রিয়তোষের সবুজ বাড়িতে। এই এক সপ্তাহ ধরে নিয়মিত গিয়েছে সে সকালে ওখানে পড়াতে। পড়িয়ে খেয়ে দেয়ে কলেজস্ট্রীটের কাজ সেরে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা ছ'টায় ফিরে পড়িয়ে আবার খেয়ে-দেয়ে রাত দশটা এগারোটায় সোনার পুরেব বাসায় এসে শুয়েছে।

হ্যাঁ, গতকাল রবিবার কলেজস্ট্রীটের কাজ না থাকায় বালিগঞ্জে না গেলেও পারতো প্রিয়তোষ। কথা ছিল ছুটির দিনে সে পড়াতে

আসবে না—শুধু খেয়ে যাবে দু'বেলা—বাকি সকাল বিকেল সকলের বিশ্রাম ছাত্র ছাত্রী ও মাষ্টারের। কিন্তু বিশ্রাম নেয়নি কাল প্রিয়তোষ সারাদিন।

ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে খেয়ে-দেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল সে কলকাতার দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখাবার জন্য। শিক্ষাদানের ওই নতুন পদ্ধতি তারই আবিষ্কার। তার ধারনা এ ভাবে ভ্রমণের মাঝে ছাত্র-ছাত্রীরা একঘেঁয়েমী থেকে মুক্তি পায় ও শিক্ষককে বন্ধু হিসেবে সংগে পেয়ে তার অনুগত হয়। বড়ো-ছেলে মেয়েদের বাধ্য করার এটাও একটা উপায় বৈকি।

না, ছোটবাবু বা ছোট গিন্নী ওঁরাও বাধা দেন নি। বরং খুশিই হয়েছিলেন যেন ওঁরা। প্রিয়তোষ অবশ্য আগেই অনুমতি নিয়ে রেখেছিল ওঁদের।

বেরবার সময় মোটা অংকের একটা টাকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন ছোট বাবু ওর হাতে। বলেছিলেন, যা লাগে খরচ করবেন—

– তা' বলে এত?

—এত আর কি—মাত্র একশো টাকা। রাখুন—কী দরকার হয় না হয়, বাঁচলে না হয় ফেরৎ দেবেন।

—আচ্ছা।

জমিদারী মেজাজ একেই বলে। প্রিয়তোষ অবাক হলো। এক দিনের সফর কোলকাতা শহরের ভিতরে—তার জন্যে প্রয়োজন বোধে খরচের পরিমাণ একশো। বেশ, দেখা যাক না কী লাগে?

একটা ট্যাক্সী ভাড়া করে চৌরঙ্গী এসে নামলো প্রিয়তোষ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। এই এলাকাটাই ঘুরবে ওরা আজ।

হ্যাঁ, সকাল দশটায় বেরিয়ে রাত সাড়ে সাতটায় ফিরলো সকলে। ছাত্র-ছাত্রীরা খুব খুশি। খুব ঘুরেছে ওরা। মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া, রাজভবন, লাল বাজার, রাইটার্স বিল্ডিং হাওড়ার পুল ইত্যাদি সব দেখেছে ওরা। ট্যাক্সিই করেছে পাঁচ-ছ'য় বার—এটা ওটা খেয়েছে, রেষ্টুরেন্টও ঢুকেছে দু'বার।

হিসেব সব ঠিকই রেখেছে প্রিয়তোষ। খরচ হয়েছে পঁচাত্তর টাকার মতো। বাকিটা এসে ফেরত দিলো ছোটবাবুর হাতে।

সেদিন রাতে আর সোনারপুরে ফেরা হলো না প্রিয়তোষের। সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে শরীরটা ছিল ভীষণ ক্লান্ত। কাল থেকে শীতটাও বেশ জাঁকিয়েই পড়েছিলো। খেতেও দেরি হয়ে গিয়েছিল একটু সেদিন। তাছাড়া খাবার পর ছাত্র ছাত্রীদের দুই বোন অর্থাৎ এ বাড়ির দিদিমণি আর পাপিয়াও জুটে ছিল এসে গল্পের আসরে।

পাপিয়ার সঙ্গে আগে আলাপ হয়েছিল। দু'একদিন পড়া বুঝে নিতে এসেছিল সে প্রিয়তোষের কাছে। কিন্তু দিদিমণির সংগে আলাপ আজ প্রথম।

মেজ কর্তার মেয়ে সোমা এ বাড়ির চার ভাইয়ের মেয়েদের মধ্যে সবার বড়। চাকর বাকর সবার কাছে তাই সে দিদিমণি। কিন্তু আসল নাম তার সোমা। বছর বাইশ-তেইশ বয়েস। দেখতে-শুনতে সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী—গায়ের রং ফর্সা।

সে যেচেই আলাপ করলো এসে আজ মাষ্টার মশাইয়ের সংগে।

প্রিয়তোষ ছাত্র ছাত্রীদের সংগে গল্প করছিল। সোমা এসে সে আসরে যোগ দিয়ে বলল, কোথায় ঘুরলেন ওদের নিয়ে মাষ্টার মশাই ?

—ঘুরলাম কলকাতার আসল-আসল কয়েকটা দেখবার জায়গায়।

কথাবার্তা শুরু হলো। এ কথা সে কথার পর সোমাই বলল, এত রাতে যাবেন আবার সোনারপুরে ?

—হ্যাঁ।

—কী করবেন আবার ওখানে গিয়ে—সেই তো কাল সকালে আসতে হবে আবার। ওর থেকে রাতে থেকেই যান এ বাড়িতে—বাড়িতে যখন কেউ নেই তখন কী করবেন ওখানে গিয়ে ?

মন্দ প্রস্তাব নয়। এ বাড়িতে থাকারই তো কথা তার। খবরটা ছাত্র ছাত্রীরা তাদের মাকে জানাতে তিনিও খুশি হলেন। বললেন, আমিতো প্রথম দিন থেকেই বলে আসছি আপনাকে এখানে থাকতে।

সারাদিন খেটে রাতে ওখানে গিয়ে কী হয় আপনার, কী আর এমন জিনিস পত্র আছে আপনার ঘরে যে চোরে নেবে ?

—তা ঠিক। কিন্তু আপনার অসুবিধে হবে না তো ?

—না না, কী যে বলেন—

খাবার পব ছোট গিন্নীর পাশের ছোট ঘবটায় অর্থাৎ যে ঘবে সন্ধ্যায় পড়াতে বসতে হয় সেই ঘবেই শোবার ব্যবস্থা হলো প্রিয়তোষের। বামমোহন পবিপাটি করে বিছানা পেতে দিলো তক্ত-পোষেব উপরে মশাবি খাটিয়ে। না ঘুমুতে অসুবিধে হলো না।

সোনারপুরেব সংগে সম্পর্ক উঠেই গেল একরকম। সপ্তাহান্তে ববিবার দুপুরেব দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে এসে ঘরে এক বার ঘুরে যেত শুধু প্রিয়তোষ। ঘর তালা বন্ধই থাকতো। ছোটকর্তা বহুবার ঘব ছেড়ে দিয়ে মালপত্র নিয়ে তাঁদেব বাড়িতে উঠে আসতে বললেও ঘরটা কেন যেন ছাড়লো না সে তবু।

টাকার অভাব এখন আর তত নাই। প্রুফ দেখে আয় হচ্ছে কিছু কলেজস্ট্রাট থেকে। ছাত্র-ছাত্রীদেব বাড়িতে খাওয়া থাকা বাদে মাইনে মিলছে কিছু—খরচ নেই সামান্য হাত খরচ ছাড়া।

মাসে পনেরো টাকা বাড়ি ভাড়া যায় যাক—ক্ষতি কী ? তবু তো নিজের একটা আস্তানা ওর রইলো—দরকার হলে সেখানে এসে দাঁড়াতে পারবে ভবিষ্যতে।

দিনগুলো কেটে যাচ্ছে একটানা কাজ কর্মের ভিতর দিয়ে। রুটিনের ভিতর দিয়ে। রুটিন বাঁধা জীবনযাত্রা প্রিয়তোষের।

সকালে উঠে জল খাবার খেয়ে পড়াতে বসা, স্নান খাওয়া সেরে দশটায় কলেজস্ট্রীট গিয়ে প্রুফ্ দেখা সন্ধ্যায় ফিরে পড়াতে বসা এবং তারপরে খেয়ে দেয়ে কোনদিন বিছানায় বসে প্রুফ দেখা বা শুয়ে পড়া এ ভাবেই চলছে।

এক মাস হলো এসেছে প্রিয়তোষ সবুজ বাড়িতে। এই এক মাসে সে এ বাড়ির একজন হয়ে উঠেছে। ছোটগিন্নী বাদে মেজ ও বড় গিন্নীর সংগেও আলাপ হয়েছে এতদিনে। অবশ্য, তাঁরাই যেচে এসে আলাপ করেছেন ওর সংগে।

সবার মুখেই মাষ্টার মশাইয়ের কথা। অনেক মাষ্টার এ বাড়িতে এসেছে গেছে কিন্তু এমন মাষ্টার নাকি আসেননি এখানে। প্রিয়তোষ একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা এ বাড়ির অবাধ্য ছেলেটিকে বাধ্য করেছে।

তিন ভাইয়ের তিনটি সংসার এ বাড়িতে। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে পরস্পরে মন কষাকষি থাকলেও সামনা-সামনি তিন গৃহিনীর পরস্পর কথাবার্তা চলে—ছেলে-পুলেরা এ ঘর ও ঘর যাতায়াত করে। সেই সুবাদে মাষ্টার মশায়ের তিন চার দিন নিমন্ত্রণ হয়ে গেল বড় ও মেজ তরফে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে।

সোমা আর পাপিয়া প্রায়ই আসে প্রিয়তোষের কাছে। ওদের ভাইয়েরা অবশ্য এ দিকে ঘেঁসে না বড় একটা। নেহাত সামনা সামনি দেখা হলে দু'একটা কথা বলে প্রিয়তোষের সংগে—সে' ও জবাব দেয় সংক্ষেপে।

প্রায় রাতে খাবার পর গল্পের আসর বসে। সোমা আর পাপিয়ার উৎসাহ-ই বেশি। দীপকও থাকে। অঞ্জু আর অমি খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। ওদের মা জেঠিরা যোগ দেন ওদের বদলে। কোনদিন ছোট কর্তাও থাকেন। অবশ্য বেশির ভাগ রাতেই অনেক রাত করেন তিনি ফিরতে।

বক্তা প্রিয়তোষ—শ্রোতা ছাত্র ছাত্রী এবং তাদের মা, জেঠিরা। আসরের শেষে আর প্রুফ দেখার উৎসাহ থাকে না। যদিও সব দিন রাতে প্রুফ থাকে না কিন্তু যে দিন থাকে সেদিন কাজকর্মের ক্ষতি হয়। দু'একদিন রাতে প্রুফ নিয়ে গিয়েও পরের দিন তা' না দেখা অবস্থায়ই কলেজস্ট্রীট ফিরিয়েও নিয়ে যেতে হয়েছে প্রকাশকদের কাছে।

তাঁরা প্রশ্ন করেছেন, কী হলো—দেখেননি এখনও?

—না, সময় পাইনি।

—তা'হলে নিয়ে গেলেন কেন ?

প্রিয়তোষ জবাব দেয়নি। বলেছে, আচ্ছা দেখে দিচ্ছি এখুনি।

এ ভাবেই চলছে।

সেদিন রাতে খাবার পর গল্পের আসব না বসিয়ে প্রুফ্ নিয়ে বসেছিল প্রিয়তোষ। মেজ গিন্নী এলেন এ ঘরে।

—এখন আবার কী কাজ করতে বসলেন ?

—এই একটু জরুরী কাজ আছে একটা।

—আরে, রেখে দেন তো জরুরী কাজ—আমরা এলাম বলে গল্প করতে, আর আপনি এখন কাজ করতে বসলেন! ও সব পরে হবে—এখন বলুন তো সামনের রবিবার ছাত্রদের নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন ?

—ঠিক নেই—যা হয় কাল ঠিক করা যাবে, কিছু। বেরিয়ে যেদিকে হোক গেলেই হবে।

—না, আপনি একেবারে পাগলা মানুষ!

—কেন ?

—পাগল না হ'লে কেউ এমনি না ভেবে-চিন্তে বেরোয় ?

—তা' যা বলেন—

তক্তপোষের উপর বসেছিল প্রুফ দেখতে প্রিয়তোষ। রামমোহন ওর নির্দেশে এক গ্লাস জল ঢেকে রেখে গিয়েছিল ছোট আলমারীটার মাথায়।

মেজ গিন্নী তার পাশেই একটা চেয়ারে বসেছিলেন। একটু জল খাবার জন্য গ্লাসটা ধরতে গেলে ওঁকে অতিক্রম করতে হয়।

তাই প্রিয়তোষ ওঁকেই বলল, দেখি জলের গ্লাসটা একটু দিন তো—একটু জল খাই—

মেজ গিন্নী উঠলেন তাঁর থপথপে কোলা ব্যাঙের মতো পৃথুল দেহটাকে নিয়ে। হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা নিয়ে প্রিয়তোষের হাতে

দিয়ে বললেন, আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে মাষ্টার মশাই ?

—কি ?

—বিয়ে করলেন না কেন আপনি—বলি, বয়েস তো আর খুব কম হ'লো না আপনার ?

—এ সব ব্যক্তিগত ব্যাপার—

—ভালো বেসেছিলেন বুঝি কাউকে ?

ছোটগিন্নী এলেন এ সময় এ ঘরে। পাশের ঘরে তাঁর শয়ন কক্ষের বিরাট খাটটায় ঘুমুচ্ছে অঞ্জু অমি আর দীপক। ছোট কর্তা আজ ফেরেননি এখনও বাড়িতে। রাত এখন পৌনে বারোটা। হয়তো মেজকর্তাও আসেননি এখনও।

শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে ক'দিন থেকে। জানালা দরজা বন্ধ থাকে সব এ ঘরের। তবু বেশ শীত লাগছে। লেপ জড়িয়ে বিছানায় বসেছিলো প্রিয়তোষ প্রুফ দেখতে।

গায়ের শালটাকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ছোটগিন্নী এসে বসলেন তক্তপোষের একধারে। ওদের কথার জের টেনে বললেন মেজগিন্নীর উদ্দেশ্যে, মাষ্টার মশাই বিয়ে করবেন কি—ওর ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন।

—নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার ছিল তা'হলে, না'হলে ছোটভাইয়ের বিয়ে আগে হয়ে গেল কেন—তাই না মাষ্টার মশাই ? মেজগিন্নী ভ্রু কুঁচকে তাকালেন প্রিয়তোষের দিকে।

—ব্যাপার-স্যাপার কিছু জানি না। বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়নি তাই বিয়ে করিনি। তা'ছাড়া, ও সব ব্যাপার সামলাবার মতো ক্ষমতা কই আমার ? প্রিয়তোষ জবাব দিলো ধীরে।

ছোট গিন্নী বললেন, কী বলছেন আপনি—ক্ষমতা নেই আপনার সে কি কথা, আপনি কি কম টাকা উপায় করেন নাকি ?

মেজ গিন্নী সায় দিলেন ওঁকে, ঠিক বলেছিস্ ছোট, মাষ্টার মশাই

আসলে কিপ্টে লোক—বিয়ে করলে আমাদের খাওয়াতে হবে, তাই করছে না।

গম্ভীর ভাবে প্রিয়তোষ শুধু বলল, হুঁ—

রাত এখন একটা। শীতের রাত হলেও, এ বাড়িতে বেশি রাত নয় এখন।

একটা দেড়টার আগে আলো নিভবে না এ বাড়ির। একতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত অনেক ঘরেই চলছে ক্যারাম বা তাস এর আড্ডা, হৈ চৈ বা গল্প, ঝগড়া বা মারামারি, হাসি-ঠাট্টা বা গান, রেডিও বা রেকর্ড প্লেয়ারের গান কিম্বা ঝি-চাকর-ঠাকুর বা আমলা গোমস্তাদের গল্প গুজব বা পরামর্শ ও আলোচনা।

এ সব দৈনন্দিন ব্যাপার। প্রিয়তোষ অবশ্য অত রাত করেনা—এগারোটার পরই সে শুয়ে পড়ে প্রায় প্রত্যহ। আলো নিভে যায় এ ঘরের। তবে দরজা বন্ধ করে সে-নির্দেশ নেই। ছোট গিন্নীর ঘরের ওধারের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে যায় সন্ধ্যার সময়। শুতে যাবার আগে পর্যন্ত তিনি মাঝের দরজা দিয়ে এ ঘরের ভিতর থেকে খাবার রান্নার জায়গায় বা কল পায়খানায় যাতায়াত করেন।

প্রিয়তোষের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। পাশেই রেল ষ্টেশন। বারোটা পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাতায়াত করে। তারপরেও আছে মালগাড়ি সারারাত ধরে। তবে, ওর মধ্যেই চোখ বুঁজে আসে এক সময়ে এক আধ ঘণ্টার মধ্যে।

তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আজ আরও একটু আগে শুয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল। ন'টায় ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে রামমোহনকে তাড়া দিয়ে তাই সাড়ে ন'টার মধ্যেই খেয়ে প্রুফ নিয়ে বসেছিল প্রিয়তোষ।

প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল কাজটুকু—দু'এক পাতা বাকি আর। এমন সময় এলেন মেজগিন্নী—একটু পরে ছোটগিন্নীও এসে বসলেন। ওঁদের উঠে যেতে বলাটাও অভদ্রতা। কী করবে ভাবতে লাগলো সে।

সোমা এলো হঠাৎ। তার বাবা অর্থাৎ মেজকর্তার খাবার রাঁধুনিকে

ঢাকা দিয়ে রাখতে বলে মা-মেয়েকে খেতে দেবে কি না এখন জিজ্ঞেস্ করতে এসে সেও বসে পড়লো আর একটি চেয়ারে।

মেজগিন্নী বললেন মেয়েকে, আর একটু দেখ্ তারপর না হয় বলিস্ বামুনদি'কে তোর বাবার খাবার চাপা দিতে। শীতের রাত— এখন খাবার চাপা দিলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না? মাংসটা বরং আবার গরম বসাতে বল গিয়ে।

সোমা উঠলো না। মাংস গরম হলো কিনা বাবার জন্য সে ব্যাপারে মাথা ব্যাথা আপাততঃ তার দেখা গেল না। মাষ্টারমশায়ের দিকে চেয়ে সে বলল এবার, আজ আবার একটা গল্প বলুন না মাষ্টারমশায়!

গল্প শোনার বড় সখ সোমার। পাপিয়ারও। সে ছিল না আসরে। হঠাৎ সেও এসে গেল এ ঘরে।

মেজগিন্নী বললেন, তাহ'লে একটা গল্পই বলুন মাষ্টারমশাই, আমরাও শুনি।

পড়াশোনা বেশিদূর হয়নি সোমার। সুন্দরবনের আবাদে কাছারী বাড়িতেই ছিল সে এতকাল। বছব দুই মাত্র এসেছে কোলকাতার এ বাড়িতে।

তাদের জমিদারীতে ঠাকুরাদার সাহায্যপুষ্ট একটি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল ছিল। ওখানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে পড়াশোনার পাঠ সাঙ্গ করতে হয় তাকে। আর পড়ার সুযোগ ছিল না।

এখন কোলকাতায় এলেও আর উপায় নেই। বড় হয়েছে সে অনেক। স্কুলে যাবার বয়েস আর তার নেই। ওদের সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন নেই তেমন। আজকাল যুগ বদলে গেলেও, ঠাকুরমা-ঠাকুরদার মত না থাকায় সময় কালে কলকাতায় এনে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়নি তাকে।

সোমার বয়েস এখন বাইশ-তেইশ। দেখতে শুনতে অপূর্ব সুন্দরী সে। যেমনি গায়ের রঙ, তেমনি স্বাস্থ্য—সুন্দর নাক চোখ মুখ। এ মেয়ের এখনও বিয়ে হচ্ছে না কেন এটা একটা প্রশ্ন। জবাবটা শুনেছে প্রিয়তোষ ছোটগিন্নীর কাছ থেকে। ওদের সমাজে নাকি উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না সোমার জন্য—তাই বিয়ে হচ্ছে না ওর।

টাকার অভাব নেই সোমার বাবার। জ্যেষ্ঠা নাতনি ছিল ঠাকুরদার চোখের মণি। বেশ কিছু টাকা ওর বিয়ের জন্য ব্যাঙ্কে তোলা রয়েছে ঠাকুরদার ইচ্ছায়। কিন্তু পাত্র কই? অবশ্য চেষ্টা যে না চলছে এমন নয়। মাঝে-মধ্যে দু' একটি প্রস্তাব এলেও কন্যাপক্ষের পছন্দ হচ্ছে না তা'।

কাজেই সোমা আছে। খাওয়া-ঘুমোনো ছাড়া আপাততঃ কোন কাজ নেই তার। চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ির মধ্যে বন্দিনী সে। বাইরের পথঘাট কিছুই চেনে না সে। আর, আদেশও নেই বাইরে যাবার তার। ওদের সমাজে সে রেওয়াজ চালু হয়নি এখনও।

সুযোগ পেলেই তাই সোমা আসে প্রিয়তোষের কাছে। অবশ্য, প্রিয়তোষের সময়ের অভাব খুব। তবু প্রত্যহ রাতে ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি হয়ে যাবার পর থেকে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত যে সময়টা ওই সময়টাতেই গল্প শোনাতে হয় ওকে।

প্রিয়তোষ এক একদিন এক একটা গল্প শোনায়। কোনদিন মহাপুরুষদের জীবনী, কোনদিন কোন রামায়ণ মহাভারত বা দেশ বিদেশের গল্প শোনাতে হয়। সোমা উৎসাহ ভরে শোনে আর অবাক হয়ে মাষ্টারের পাণ্ডিত্য অনুভব করে।

আজ আর উৎসাহ নেই। শরীরটাও ক্লান্ত। তবু সবাই যখন ধরলো জোর করে এমনকি মেজগিন্নী ছোটগিন্নী পর্যন্ত তখন বাধ্য হয়েই বলতে হলো প্রিয়তোষকে, আজ থাক—বড্ড ঘুম পাচ্ছে আজ,, কাল একটা ভালো গল্প বলবো।

ছোটগিন্নী আর মেজগিন্নী উঠে গেলেন এবার। কিন্তু সোমা

আর পাপিয়া উঠলো না। সোমা বলল, ও কথা বললে শুনছি না—গল্প না শুনে আমি উঠছিই না।

পাপিয়া বলল, তাহ'লে একটা ছোট গল্পই বলুন মাষ্টারমশায়।

—ছোট গল্প?

প্রিয়তোষ আরম্ভ করলো, গ—ল আর প—

এ গল্প আগে হয়ে গেছে অনেকবার। গ্রাম্য ভাঙা মাটির রাস্তা পেরোতে গিয়ে গ আগে জল পেরিয়ে গেল, প ছোট থাকায় ল-এর কাঁধে উঠলো। ব্যস, হয়ে গেল গল্প। এ গল্প আবার কে শোনে?

সোমার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেল এবার। সে উঠলো। পাপিয়া এখন একা এ ঘরে শ্রোতার দলে। বাধ্য হয়ে বিরস বদনে তাকেও চলে যেতে হলো এর পরে।

আলো নিভিয়ে প্রিয়তোষ শুয়ে পড়লো। পাশের একটা বাড়ির দেওয়াল ঘড়িতে এ সময় ঢং ঢং করে সময় গণনার ঘণ্টা বেজে উঠলো—চোখ বুঁজে তিনটি ঘণ্টা পুরোই শুনতে পেলো প্রিয়তোষ।

সকাল ছ'টার মধ্যেই উঠে পড়তে হয় প্রিয়তোষকে। শীতের সকাল বেলাটা লেপ-কম্বল ছেড়ে ওঠাটা বড়ই কষ্টদায়ক। তবু উঠতে হয়!

অবশ্য সাতটা থেকেই পড়াতে বসে সে—একটি ঘণ্টা তবু হাতে রাখতে হয় প্রভাতকালীন কর্মসূচীগুলি সেরে নেবার জন্য।

উঠেই হাত মুখ ধুয়ে রেডিওটা খুলে দেয় প্রিয়তোষ। ছোটগিন্নী সেই শব্দ শুনে ছেলেমেয়েদের ডেকে তোলেন। ওরা মুখ ধুয়ে এলে রামমোহন প্রাতঃরাশ দিয়ে যায় সবাইকে এক সংগে কানা উঁচু বড় বড় থালায় এক কাঁড়ি মুড়ি, বাসি দুধ, কলা আর চিনি। ছাত্র খেয়ে বই নিয়ে বসে ছাত্রীরা স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। রামমোহন সেই ফাঁকে চা করে ফেলে এক কাপ। ওই কাপটি না আনা পর্যন্ত মেজাজ আসে না পড়াতে বসতে।

এখন বেলা সাড়ে সাতটা। দীপককে একটি অঙ্ক কষতে দিয়ে প্রিয়তোষ ছাত্রেরই একটি বইয়ে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল একটু। পাপিয়া এলো এ ঘরে।

মাষ্টারের চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আব্দারের সুরে বলল, আমাকে এই অঙ্কটা একটু করে দিন না মাষ্টারমশাই!

—দেখি—

ওর হাত থেকে খাতা আর বই নিয়ে অঙ্কটির প্রতি নজর দিলো প্রিয়তোষ।

দীপক হঠাৎ বলে উঠলো এ সময় পাপিয়ার উদ্দেশ্যে, কেন, মাষ্টারমশাই দেখিয়ে দেবে কেন—নিজে করতে পারিস না?

পাপিয়া জবাব দিল সংগে-সংগেই, তুই পারিস সব অঙ্ক করতে —মাষ্টারমশাই তো তোর সব অঙ্ক করে দেয়।

—বেশ তো—তোর কি তাতে? যা—পালা এখান থেকে।

—কেন পালাবো—তোকে দেখে ভয় করি নাকি আমি?

—ভয় না করলে বয়েই গেল আমার। মাষ্টারমশাই কি তোদের—আমাদের মাষ্টারমশাই কেন অঙ্ক করে দেবে তোর?

—দেবেতো—একশো বার দেবে।

দু'জনে হয়তো হাতাহাতি বেধে যেতো এর পরে। প্রিয়তোষ ধমকে উঠলো হঠাৎ ছাত্রকে, নাও, তোমাকে আর পাকামি করতে হবে না—যা করছো কারো, এ অঙ্কটা না পারলে কিন্তু খুব পিটাবো আমি!

দীপক নিজের কাজে মন দিলো এবার বেশ খানিকটা অনিচ্ছার সংগেই। পাপিয়ার অঙ্ক বুঝিয়ে দিলো প্রিয়তোষ। সে চলে গেল।

প্রায় প্রত্যহই আসতে লাগলো পাপিয়া এর পর থেকে। দীপককে পড়াবার ফাঁকে-ফাঁকে ওকে পড়া বুঝিয়ে দিতো প্রিয়তোষ। সরাসরি মাষ্টারের সামনে মারামারি করবার সাহস-না থাকলেও পাপিয়াকে সহ্য করতে পারতো না কিছুতেই দীপক।

দুই ভাই-বোন ওরা প্রায় এক বয়েসী। ছোটগিন্নী ও বড় গিন্নীর মধ্যে বৈষয়িক ব্যাপারে মন কষাকষি থাকায় তাঁদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও একটা বিদ্বেষ ভাব বজায় ছিল বোঝা যেতো।

পাপিয়া যেচে আসতো বলেই হোক আর ওর আগ্রহের জন্যই হোক মাষ্টার ছাত্রীকে পড়াশোনা না দেখিয়ে দিয়ে পারতো না। কিন্তু ছোটগিন্নী এতে অসন্তুষ্ট হলেন বেশ বোঝা গেল। তাঁর হাব-ভাবে কথা-বার্তায় তার প্রকাশ দেখা যেতে লাগলো। অথচ, প্রিয়তোষ বারণ করতেও পারলো না পাপিয়াকে আসতে।

শেষে ছোটগিন্নীর হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হলো একদিন। তিনি নিজের ছেলের পড়ার সময় তাকে বিরক্ত করার অপরাধে পাপিয়াকে ধমকে দিলেন সরাসরি। শুধু তাই নয় ওকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে ভিতর থেকে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে যেতেও ভুললেন না।

ক্রমে এটাই নিয়মে দাঁড়ালো। আজকাল সকাল সন্ধ্যায় দু'

বেলায়ই ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করেই পড়াতে বসতে হয় মাষ্টারকে। ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে কেউ বিরক্ত করতে না পারে পড়ার সময় কিম্বা তারা ইচ্ছে মতো যাতে ওই সময় উঠে বাইরে যেতে না পারে সেজন্যই এই নির্দেশ।

এ নির্দেশ ছোট গিন্নির।

পাপিয়া আর আসছে না। এদিকে সোমাও আসা বন্ধ করেছে। গল্পের আসরও বসে না আজকাল আর রাতে খাবার পর। হঠাৎ কী হলো কিছু ভেবে উঠতে পারে না প্রিয়তোষ। এ সম্বন্ধে কিছুই বলবার থাকতে পারে না তার—সে এ বাড়ির মাস্টার মাত্র—একজন আশ্রিতও বটে।

মাস তিনেক পেরিয়ে গেছে। আজকাল আর রবিবার বেরোনোও হয় না। শুধু ওই দিনটায় একবার করে সোনারপুরে ঘুরে যায় প্রিয়তোষ বিকেলের দিকে। হ্যাঁ, বাড়ি ভাড়া নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছে সে!

সেদিন কলেজস্ট্রীট থেকে ফিরে সন্ধ্যায় সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে দ্বিতলের সিঁড়ির মুখে পাপিয়ার সঙ্গে দেখা। মাস্টারকে দেখেই একটু কাছে এসে আস্তে করে বলল সে, মা একবার আমাদের ঘরে আপনাকে ডেকেছে মাস্টার মশাই!

—কেন?

—জানি না।

—আচ্ছা যাচ্ছি—চলো।

ওর সংগে ওদের ঘরে এলো প্রিয়তোষ। একটা বড় ঘরে এনে ওকে বসালো পাপিয়া। এটা ওর মায়ের শয়ন কক্ষ। বলল, আপনি বসুন মাস্টার মশাই, আমি মা-কে ডেকে আনছি।

একটু পরেই পাপিয়া তার মা-কে নিয়ে এলো এ ঘরে। বড় গিন্নীর

সংগে আগেই আলাপ ছিল প্রিয়তোষের। ভদ্রমহিলা একটু সেকেলে ধরনের।

এক হাত ঘোমটার ভিতর থেকে বললেন, পাপিয়াকে একটু পড়ান না এবার থেকে মাস্টারমশাই।

—কিন্তু আমার সময় কই?

—কেন, সকালে তো দীপক একা পড়ে। ওই সংগে ওকেও নিন্ না।

—না, তা' হয় না।

—কেন?

—ওদের মত নেই।

—তাহ'লে উপায়—এদিকে মেয়ে বলছে, আপনার কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে পড়বে না।

—সে কি! তা' আমি তো এসেছি মাত্র কয়েক মাস—এর আগে কার কাছে পড়তো?

—কারো কাছেই না। অনেক আগে অবশ্য একজন বুড়ো মাস্টারমশাই ছিলেন। তা' উনি চলে গেছেন অনেকদিন। ও স্কুলে যেতো না বলে ওর বাবাই ছাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁকে। এখন আপনাকে পেয়ে পড়ার ইচ্ছে হয়েছে ওর আবার।

—তাই নাকি—তাহ'লে তো পড়াতে হয়, কিন্তু সময় পাই কোথায়?

শেষ পর্যন্ত সময় একটা পাওয়া গেল। পেলো প্রিয়তোষ নিজেই। সন্ধ্যা সাতটা থেকে দীপকদের পড়াবার কথা—তার আগে যদি পাপিয়াকে পড়িয়ে যাওয়া হয়। হ্যাঁ, ওই সময়টিই নির্দিষ্ট হলো।

পরের দিন থেকে পাপিয়াকে পড়াতে শুরু করলো প্রিয়তোষ। সাড়ে পাঁচটায় টাইম। এজন্য পাঁচটায় ট্রেন ধরতে হলো শিয়ালদহ থেকে এবং সাড়ে চারটার মধ্যে বেরোতেও হলো কলেজস্ট্রীট থেকে।

প্রুফ্ দেখায় আরও একটু ঢিলেমী দিতেও হলো এজন্যে। হোক, প্রুফের থেকে টিউশানীর আয়ই এখন বেশি।

পাপিয়ার মা আগেই কথা বলে নিয়েছেন। মাইনেও একটা ধার্য হয়েছে এজন্য। ঠিক হয়েছে মাসিক কুড়িটাকা করে দেবেন তিনি প্রিয়তোষকে এই পড়াবার পারিশ্রমিক হিসাবে। সে রাজি হয়েছে।

খবরটা প্রথম দিনেই জানাজানি হয়ে গেল। পাপিয়াদের ঘর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আসতে না আসতেই অঞ্জু বলল, মেজদিদের ঘরে গিয়েছিলেন কেন মাষ্টার মশাই?

—এমনি—ওরা ডেকেছিল।

—ওকে পড়াবেন আপনি?

—হ্যাঁ।

ছোটগিন্নী বললেন, কিন্তু এখানে পড়ালে আপনার দাদা অসন্তুষ্ট হবেন। পাপিয়াকে পড়াতে হয় ওদের ঘরে গিয়েই পড়াবেন।

—তাই পড়াবো। ঠিক করেছি কলেজস্ট্রীট থেকে ফিরে ওকে পড়িয়েই তবে তিনতলায় উঠবো। আপনাদের আপত্তি নেই তো এতে?

—আমাদের আপত্তির কী আছে—তা' মাইনে কিছু দেবে বলল ওর মা?

—হ্যাঁ, কুড়িটাকা করে দেবেন বলেছেন।

ছোটগিন্নী যে খুশি হলেন না তা' তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। মুহূর্তেই তাঁর মুখটা মেঘে ঢাকা চাঁদের মত ম্লান হয়ে গেল! চলে যেতে যেতে উচ্চারণ করলেন তিনি একবার, এত পয়সা খাবে কে আপনার—এবার একটা বিয়ে-থা করুন!

প্রিয়তোষ জবাব দিল না সে কথার। অঞ্জু, অমিতা, দীপক ওরা বই নিয়ে বসেছিল। ওদের উদ্দেশ্যে বলল, নাও পড়া শুরু করো সকলে এবার—সময় নষ্ট করো না!

রামমোহন জল খাবার নিয়ে এলো এ সময়। গরম দুধ, মুড়ি কলা আর চিনি।

দীপক বলল, আগে খেয়ে নেবো মাষ্টার মশাই?

—নাও।

ঘরের দরজা রামমোহন ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

একটু পরে সে আবার আসবে এ ঘরে চা নিয়ে। তারপরে প্রিয়তোষ উঠে ভিতর থেকে ছিট্‌কানি বন্ধ করে দেবে এটাই নিয়ম—যাতে পড়ার সময় এ বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা কেউ এ ঘরে ঢুকতে ও হৈ-চৈ করতে না পারে ছোট গিন্নীর নির্দেশে এটাই ব্যবস্থা হয়েছে কিছুদিন হলো।

সবাই খাচ্ছে।

হঠাৎ পাপিয়া ঢুকলো ঘরে। বেশ ক'দিন পড়ার সময় সে আর আসেনি—আজ আসতে বাধা নেই, কারণ প্রিয়তোষ কাল থেকে তারও মাস্টার।

অঞ্জু বলল, কিরে মেজদি, তুই কাল থেকে আমাদের মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়বি?

—হ্যাঁ। পাপিয়া এসে দাঁড়ালো দীপকের পাশে। বয়সে সে ওর থেকে দু' বছরের বড়। পড়ে অবশ্য একই ক্লাশে—অর্থাৎ ফাইভে। ওদের একই ইংরাজী বই।

বলল, তোদের ক'টা গল্প পড়িয়েছে রে?

খেতে খেতে দীপক বলল, তোকে বলব কেন—যা এখান থেকে।

দীপক সহ্য করতে পারে না কখনও পাপিয়াকে।

এখুনিই একটা না একটা অজুহাতে হয়তো ঝগড়া বাধিয়ে বসবে ওর সংগে। তাই আগে থেকেই ওকে সরিয়ে দেবার জন্য প্রিয়তোষ বলল, এখন তুমি ঘরে যাও—ওদের পড়া হয়ে গেলে এসো।

—আচ্ছা। পাপিয়া চলে গেল।

পরদিন বিকেলে কলেজস্ট্রীট থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পাঁচটার ট্রেন ধরে ঠিক সওয়া পাচটায় সবুজ বাড়ি পৌঁছলো প্রিয়তোষ।

দোতলার ঝুল বারান্দায় পথের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল পাপিয়া। প্রিয়তোষ আসতেই করিডোর থেকেই ওকে আহ্বান করে ঘরে নিয়ে এলো সে।

বেশ একটা বড় ঘরে মাস্টারকে এনে বসালো পাপিয়া। এ ঘরটি স্বয়ং কর্তার। তিনি গত হওয়ার পর থেকে ঘরটি খালিই পড়ে থাকে এখন।

এ ঘরে প্রথম প্রবেশ করলো আজ প্রিয়তোষ। চারিদিকে দেখতে লাগলো সে ভিতর থেকে চোখ বুলিয়ে।

বিরাট একখানি পালঙ্ক ঘরের অর্ধেকটা জুড়েই অবস্থান করছে। বিরাট উঁচু গদী তার উপরে তোষক বালিশ দামী বেড্‌কভার দিয়ে ঢাকা।

ঘরটি বহুদিন ব্যবহৃত না হলেও শয্যাটি যে প্রত্যহ ঝাড়া-মোছা হয় সে লক্ষণ সর্বত্র সুপরিস্ফুটিত।

এছাড়া একধারে বিরাট দু'টি কাঠের আলমারি অন্যধারে ডবল সীটের একটি হেলান দেওয়া বেঞ্চি আর তার সামনে ফুট দুই চওড়া সরু একটি অনুচ্চ পালিশ করা টেবিল। ব্যাস্‌ আসবাব পত্র বলতে এই।

এতবড় একজন জমিদার-এর খাস কক্ষ আরও বহু মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত হতে পারতো।

তা' হয়নি—কারণ যিনি এ সম্পদের মালিক তিনি এককালে তো ছিলেন অতি সাধারণ সমাজের একটি অতি সাধারণ ঘরের একটি জনমজুর খাটা মানুষ।

কপাল গুণে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও ভোগ বিলাসটা হয়তো রপ্ত করতে পারেননি ততটা। শোনা যায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নাকি তাঁর বেশবাসও ছিল অতি সাধারণ।

বেঞ্চটা পালঙ্কের লাগোয়া।

ওটাতেই বসলো প্রিয়তোষ। টেবিলে বই খাতা কলম আগেই এনে রাখা ছিল। পাপিয়া বসলো পালঙ্কের উপর পা ঝুলিয়ে। পাঠ দান শুরু হ'ল এবার।

ছাত্রীকে আগামীকাল স্কুলে কী পড়া আছে তার রুটিন বার করতে বলতেই সে উঠলো।

বলল, দাঁড়ান দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসি আগে। বলেই সে গিয়ে দরজাটায় খিল দিয়ে এলো।

জানলাগুলো বন্ধই ছিল সব আগে থেকে আর লাইট জ্বালানোই ছিল।

পাখাটা খুলে দিলো এবার পাপিয়া।

বাংলা বই বার করলো প্রথমে পাপিয়া পড়বার জন্য। রুদ্ধ দ্বার কক্ষ—বাইরের কোন হৈ-চৈ ভিতরে প্রবেশের উপায় না থাকলেও দীপক, অঞ্জু ওদের গলার শব্দ শোনা গেল দু'একবার বাইরে থেকে।

বেশ বোঝা গেল ওরা একবার তদন্ত করে গেল পাপিয়াকে পড়াবার ব্যাপারটা সরেজমিনে।

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল ছাত্রী—পাঠ দান করছিল মাস্টার। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে।

হঠাৎ বাইরে থেকে দরজার কড়াটা নড়ে উঠলো খট খট করে বেশ সজোরেই।

—কে? জিজ্ঞেস করলো পাপিয়া বেশ উত্তেজিত সুরেই।

—আমি দিদিমণি!

—কে হরিচরণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

পাপিয়া উঠে দরজা খুলে দিতেই বৃদ্ধ চাকর হরিচরণ ঢুকলো ঘরে। মাস্টারের চা আর জলখাবার এসেছে। থালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে চলে গেল সে।

হরিচরণ বড় তরফের খাস ভৃত্য! খোদ কর্তার আমল থেকেই

আছে এ বাড়িতে—ভাগের সময় বড় তরফের ভাগে পড়েছে তার ডিউটি।

পাপিয়া দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে এসে বসলো তার আসনে অর্থাৎ শয্যায় পা ঝুলিয়ে।

বলল, আগে খেয়ে নিন মাস্টার মশায় !

—হ্যাঁ,—

খেতে শুরু করল প্রিয়তোষ সংগে সংগেই। মাইনেব সংগে এই জল খাবারটাতো ফাউ। যা পাওয়া যায়। তাছাড়া, ক্ষুধার্তও ছিল সে বেশ—সকালে খেয়ে বেরোবার পব কলেজস্ট্রীটে দু'কাপ চা ছাড়া কিছুই টিফিন করা হয়নিতো।

এর নাম জল খাবার। জমিদারবাবুব বাড়ির জলখাবার।

বিরাট পিতলের একটি থালা। কে জানে এটিও খোদ কর্তার আমলের সাক্ষ্য বহন করছিল কিনা। দিস্তে দু'য়েক লুচি, তিনশো গ্রামের মতো আলু ভাজা আর শ'দুয়েক চিনি। ভেবেছিল এত খেতে পারবে না।

কিন্তু খেতে খেতে দেখলো সবটাই খাওয়া হয়ে গেল। লজ্জিত হলো মাস্টার তার নিজের জল খাবাবের পরিমাণ দেখে। আশ্চর্য, খাওয়ার পরিমাণ এত বেড়ে গেছে তার এ বাড়িতে মাত্র কয়েকমাস এসেই !

অবশ্য স্বাস্থ্যটা বেশ তাগড়াই হয়ে উঠেছে ওব এ কয়েক মাসে। মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো প্রিয়তোষ।

মাস্টার-এর জল খাবার গ্রহণের সময় ছাত্রী কিছু কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার জেনে নিচ্ছিল তাঁর। যেমন বাড়িতে তাঁর কে-কে আছে, তিনি বিয়ে-থা করেননি কেন, তাঁর ভাইয়ের অবস্থা কেমন ইত্যাদি। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জবাব দিতে হচ্ছিল মাস্টার কে কিছু কিছু।

এখন খাওয়া শেষ হতেই সচকিত হয়ে উঠলো মাস্টার। না, অনেকটা সময় চলে গেল। আলমারির মাথায় একটা টাইম পিস্ রাখা ছিল এ ঘরে।

ওর কাঁটা দু'টো সময়ের হিসেব করে চলছে একটানা। একবার ওদিকে তাকাতেই দেখলো প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে।

বলল, প্রথম দিন এর থেকে আর বেশি সময় দিতে পারলাম না—সাতটায় উঠতে হবে আমাকে। দু'একটা অঙ্ক করে নাও এবারে।

—আচ্ছা।

পাপিয়া অঙ্কের বইটা এগিয়ে দিলো মাস্টারের দিকে।

প্রিয়তোষ একটা অঙ্ক করতে দিলো ছাত্রীকে। কিন্তু খাতা খুলে ছাত্রী বলল, এটা আপনি একটু দেখিয়ে দিন না মাস্টার মশাই!

—আচ্ছা দাও।

পাপিয়া উঠে খাতা কলম ও অঙ্ক বই সহ মাস্টারের সামনে এগিয়ে এলো এবার।

টেবিলের উপর বই খাতা রেখে কলমটা ওর হাতে দিয়ে বলল, ওখানটায় বসতে বড় অসুবিধে হচ্ছে—আমি এখানে দাঁড়িয়ে দেখছি, আপনি বুঝিয়ে দিন।

প্রিয়তোষ বুঝলো ব্যাপারটা। সত্যিই এতক্ষণ খুব অসুবিধেই হচ্ছিল পাপিয়ার। পালঙ্কটা উঁচু টেবিলটা নিচু। ওখান থেকে ঝুঁকে পড়াশোনা করাটা কষ্টেরই ব্যাপার। কিন্তু ঘরে দ্বিতীয় কোন চেয়ার বা বেঞ্চি নেই।

স্নেহ বশতঃ বাধ্য হয়েই তাই তাকে নিজের পাশের শূন্য স্থানটি দেখিয়ে বলতে হলো, ঠিক আছে তুমি এখানেই বসো!

পাপিয়া মাস্টারের পাশে বসলো।

প্রিয়তোষ অঙ্কটি বুঝিয়ে দিলো ছাত্রীকে সযতনেই। ততক্ষণে সাতটা বেজে গেছে। অতএব সেদিনের মতো উঠতে হলো এবার মাস্টারকে!

ঘরের দরজা খুলে করিডোর ধরে সিঁড়ির দিকে এগোতে গিয়ে মুখোমুখি দেখা বড় গিন্নীর সংগে। তিনি চারতলা থেকে দোতলায় আসছিলেন নিজের ঘরের দিকে।

সামনে মাস্টারকে দেখতে পেয়ে মাথার ঘোমটা আর একটু টেনে দিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে বললেন, কেমন দেখলেন মাস্টার মশাই— পড়াশোনা হবে টবে ওর ?

—কেন হবে না, ভালো মাথা আপনার মেয়ের—তবে একটু অমনোযোগী এই যা। কিছু ভাববেন না, ও আমি সব ঠিক করে নেবো।

—সেই জন্যেই তো আপনাব হাতে দিলাম ওকে—দেখবেন যাতে এবারটা পরীক্ষায় পাশ করতে পাবে।

পরদিন যথাসময়ে আবার পাপিয়াকে পড়াতে এলো প্রিয়তোষ। ছাত্রী আগে থেকেই দ্বিতলের ঝুল বারান্দায় পথের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল মাস্টারের জন্য।

এ ক'মাসে পাপিয়ার সম্বন্ধে অনেক শুনেছে প্রিয়তোষ ছোটগিন্নী ও মেজ গিন্নীর কাছ থেকে।

বড় গিন্নীব শাসন নেই মোটে একমাত্র মেয়েটির ব্যাপারে তাই নাকি সে বাবা-মা-দাদা এমন কি বাড়ির কাউকেই কেয়ার করে না। ইচ্ছে হলে পড়তে বসে না হলে পড়ে না—স্কুলে খেয়াল হলে যায় না হলে যায় না। আর, এ জন্যই নাকি পরপর দু'বছর ক্লাইভে ফেল্ করেছে সে।

আজ দ্বিতীয় দিনেও ওকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রিয়তোষের মনে হলো তা'হলে এবার পড়ার দিকে মন হয়েছে পাপিয়ার—এটা আনন্দের কথা !

না, ভাল করে পড়াতে হবে মেয়েটিকে। 'যেমন করে হোক এবার ওকে নতুন ক্লাশে তুলিয়েই ছাড়তে হবে।

ঘরে ঢুকে প্রথম প্রশ্ন করলো মাস্টার, স্কুলে গিয়েছিলে আজ ?

—হ্যাঁ।

—শুনেছি তুমি নাকি প্রায়ই স্কুল কামাই করো—আমার কাছে পড়তে গেলে কিন্তু স্কুল কামাই করলে চলবে না, বুঝলে ?

—আচ্ছা।

দরজার ছিটকিনী লাগিয়ে দিয়ে এসে মাস্টারের পাশে বসলো পাপিয়া।

ছোট টেবিলটার উপরে বই খাতা কলম পেন্সিল রাখা ছিল আগে থেকেই। একটা বই হাতে তুলে নিয়ে পাপিয়া বলল, কী পড়বো মাস্টার মশাই ?

—পড় যা খুশি—

পাপিয়া বই খুলল একটি।

কিন্তু পড়া শুনা না করে চুপ চাপ কী যেন ভাবতে লাগলো বসে।

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। মাস্টারকে বাধ্য হয়ে বলতে হলো এবার, কী হলো, চুপ চাপ বসে আছো যে—পড় খানিকটা শুনি—

—আপনি আগে বুঝিয়ে দিন—

—আচ্ছা।

ওর হাত থেকে বইটি নিল প্রিয়তোষ। ওটা ছিল ইতিহাসের বই। অনেকক্ষণ ধরে গল্পচ্ছলে বুঝিয়ে দিলো সে বিষয়টি। তারপরেই প্রশ্ন করলো দু'টি একটি।

হ্যাঁ, জবাব ও দিতে পারলো ঠিক ঠিক পাপিয়া সবই স্পষ্ট করে।

হরিচরণ কড়া নাড়লো এ সময় বাইরে থেকে। পাপিয়া উঠে দরজা খুলে দিলো।

মাস্টারের জল খাবার এলো—সেই লুচি, আলুভাজা আর চিনি। পরিমাণ সেই কালকেরের মতই।

ছাত্রীকে আজ বলল মাষ্টার, এত আমি একা খেতে পারবো না তো – এসো, তুমিও সাহায্য করো আমাকে একটু।

—আমি ও সব খাই না—

—কেন ?

—ভাল লাগে না।

—তাহ'লে আর কী করা যায়—আমি একাই খাই যতটুকু পারি।

বলেই, পাপিয়াকে একটা অঙ্ক করতে দিয়ে জল খাবারে মনোনিবেশ করলো প্রিয়তোষ।

কিছুক্ষণ গেল।

চা শেষ করে মাষ্টার প্রশ্ন করলো, হয়েছে?

—না।

—কেন?

—পারছি না।

—আচ্ছা দাও, বুঝিয়ে দিচ্ছি।

পাপিয়া অঙ্কের বই আর খাতা কলম এগিয়ে দিলো এবার মাষ্টারের দিকে। বেশ যত্ন সহকারে গণিত শাস্ত্রের সেই বিষয়টি ছাত্রীকে বুঝিয়ে দিলো মাষ্টার।

ঘড়িতে তখনো পনেরো মিনিট বাকি। প্রিয়তোষ ভাবলো পাপিয়াকে আর একটা বই বের করতে বলবে কিন্তু ছাত্রী এ সময় হঠাৎ মাষ্টারের একটা হাত নিজের দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে আব্দারের সুরে বলল, আজ আর পড়তে ভালো লাগছে না মাষ্টারমশাই, যা বাকি রইলো সে সব আমি সকালে নিজে নিজে পড়ে নেবো—ওর থেকে আপনি এখন একটা গল্প বলুন!

—আচ্ছা বলছি—বলেই, ছাত্রীর হাত থেকে নিজের হাতটাকে ছাড়িয়ে মাষ্টার এবার সত্যিই গল্প বলতে শুরু করলো একটি। বলল, এখুনি তুমি আকবরের কথা পড়লে না, এই আকবর বাদশার ঠাকুর দাদার নাম তুমি জানো?...তাঁর নাম ছিল বাবর। সেই বাবরের একটি গল্প এখন তোমাকে শোনাচ্ছি।

—কী গল্প মাষ্টারমশাই?

—বলছি—

এর পর বাবরের মৃত্যুর গল্পটি বলে সেদিনকার মতো উঠে পড়লো প্রিয়তোষ।

পাপিয়া কিশোরী হলেও কিশোরী নয়। তার ছোটখাটো দেহটা দেখলে যদিও তার বয়েস তেরো-চোদ্দর বেশি মনে হবে না কিন্তু তার আসল বয়েস সতেরো।

সর্বদা ফ্রক প'রে পাপিয়া। বেশি দামী বা রঙীন নয়, সাদাসিদে সাদা ফ্রকই প'রে।

চুলগুলো ছোট-ছোট—অযত্নে অপরিচর্যায় বড়ই ম্লান। ওকে দেখলে একটি অতি সাধারণ দীন-দুঃখীর মেয়ে বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। অন্তত প্রিয়তোষের তাই মনে হয়েছিল প্রথমদিনই। অথচ, ওর বাপেরই তো পয়সা বেশি। তবে এমনি ভিখিরির বেশে থাকে কেন পাপিয়া?

হয়তো মেজগিন্নী ছোটগিন্নীর কথাই ঠিক। ওর মায়ের হয়তো সত্যিই শাসন নেই। অতিরিক্ত আদরেই হয়তো এমনি খেয়ালী ও উদাসিনী হয়ে উঠেছে পাপিয়া।

ওকে স্বাভাবিক করে তোলবার দিকে মন দিলো মাষ্টার। সে যাতে পড়বার সময় অন্ততঃ ভালো পোষাক প'রে এবং একটু প্রসাধন-টন করে থাকে বিকেলের দিকে এ বিষয়ে ওকে বুঝিয়ে বলল প্রিয়তোষ।

দু'একদিন একটু পরিবর্তন দেখা গেল ছাত্রীর বটে কিন্তু তারপরে যে কে সে'ই।

সে একদিন পরিষ্কার বলল, সাজতে বা ভালো ফ্রক পরতে ভালো লাগে না আমার, আর সব সময় ভালো জামা প'রে থাকতে আমি পারিও না—আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

—সে কি!

তখন হাল ছাড়লো মাষ্টার। ছাত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না বলেই সে ঠিক করলো। সে মাষ্টার। পড়াবার কর্ধা তার পড়াবে সে ওকে—মাসে-মাসে টাকাটা পেলেই হলো তার। বরং ওর পড়ার দিকে লক্ষ্য দেবে সে আর একটু বেশি করে—সেটাই তার কর্তব্য।

মাস তিনেক গেল।

টাকা অবশ্য সব মাসেই ঠিক-ঠিক হাতে এলো। কিন্তু ছাত্রীর পড়াশোনার বিশেষ উন্নতি হলো না। দু' চারদিন খুব ঝোঁক দেখা গেলেও পরে দেখা গেল সে বেশ ফাঁকি দিতে আরম্ভ করেছে, মনযোগ বলতে কিছুই নেই। প্রিয়তোষ বিরক্ত হলো।

আজকাল মাষ্টার এলে তারপরে এ ঘরে আসে পাপিয়া পড়তে। তার উৎসাহ উদ্যম আর তেমন নেই।

কথা বলে সে এখন খুব কম। সাত কথায় একটা জবাব দেয়। যেন মেপে মেপেই দেয়। পড়া বেশির ভাগ দিনই পারে না—বুঝিয়ে দিলেও সংগে-সংগে ভুলে যায় সব। পড়তে বসে কি যেন ভাবে চুপচাপ।

চিন্তায় পড়লো মাষ্টার ছাত্রীর অবস্থা দেখে। এ টিউশানী ছেড়ে দেবার কথাও মনে হলো তার দু'একদিন। কিন্তু কুড়িটি টাকার মায়াও ছাড়া যায় না চট্ করে। প্রত্যহ ঠিক সময়েই আসে তাই মাষ্টার। ঘরের জানালা দরজা বন্ধই থাকে প্রথম দিনের মতো, আলো জ্বলে—পাখা চলে।

একদিন মাষ্টার বলল, আজ দরজা খুলেই পড়তে বসো।

ছাত্রী সংগে-সংগেই বলে' উঠলো জোর দিয়ে, না, তাহ'লে ওই দীপক, অঞ্জুরা এসে গণ্ডগোল করবে এ ঘরে।

—ঠিক আছে, দরজা বন্ধই থাক—জানালাগুলো খুলেই বসো আজ থেকে।

—না, পাশের বাড়ির চেঁচা-মেচি কানে এলে পড়ায় মন বসবে না আমার।

—কেন ?

—ওরা বড্ড চেঁচায় সবাই—কানে তালা ধরে যায়।

—বেশ, তা'হলে বন্ধই থাকুক ওগুলো। নাও, পড় এবার ভাল করে।

—আজ ভালো লাগছে না, কাল পড়বো খুব ভালো করে—আজ একটা গল্প বলুন মাষ্টারমশাই !

বলেই, মাষ্টারের গায়ের উপর কাঁধটা এলিয়ে দিতে চায় ছাত্রী। মাষ্টারের বিরক্ত লাগলেও, খুব বিশ্রী লাগে না। দেহটা কেঁপে ওঠে তার।

কলেজস্ট্রীটের যদুবাবু ধনেশবাবুর উক্তিগুলোও টগবগিয়ে ওঠে মনের মধ্যে এ সময় হঠাৎ। !

"গাছের ও খাবেন, তলারও কুড়োবেন" এটাই তাদের যুক্তি। হ্যাঁ, এইতো সুযোগ— এইতো উপযুক্ত পরিবেশ।

কিন্তু—। নিজের বয়েসের কথা মনে করে লজ্জিত হয়ে ওঠে প্রিয়তোষ—শিউরেও ওঠে।

পাপিয়া তার কন্যার বয়েসী। তাছাড়া, তার এতদিনের শিক্ষা, সংযম ও আদর্শের বাঁধ ভেঙে যাবে একটু ঝড়েই ? না, একবার ছন্দ পতন হলেই সর্বনাশ। নিজেকে সামলানোয় মন দিল মাষ্টার।

প্রিয়তোষ একটু সরে বসে। বসেই, ঠেলে ছাত্রীকে সোজা করিয়ে বসিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক হয়ে বসো—

সোজা হয়ে বসলো এবার পাপিয়া। বলল, শরীরটা ভালো লাগছে না—কেমন যেন মাথা ঘুরছে।

—তা'হলে আজ পড়তে বসলে কেন ?

এ কথার জবাব না দিয়ে ছাত্রী বলল, আপনি আজ একটা বড় দেখে গল্প বলুন মাষ্টারমশাই।

হরিচরণ এ সময় দরজার কড়া নেড়ে ডেকে উঠলো, দিদিমণি।

সেদিন আর পড়ানো হলো না।

জল খাবার ও চা খেয়ে দু'একটি উপদেশমূলক গল্প শুনিয়ে উঠতে হলো মাষ্টারকে ছাত্রীর কাছ থেকে। কিন্তু মেজাজটা বিগড়ে গেল কেমন যেন।

এখন আর ভালো লাগছে না উপরে গিয়ে দীপক, অঞ্জু ওদের পড়াতে। কিন্তু উপায় নেই। ধীর পায়ে তিন তলায় উঠে আসতেই হলো এক সময়।

পরদিন যথা সময়ে পাপিয়াকে পড়াতে আসতে হলো আবার। কাল সারারাত আজ সারাদিন কাজকর্মের ফাঁকে মাষ্টার ভেবেছে এই ছাত্রীটিকে। না ভেবে উপায় ছিল না বলেই ভেবেছে।

দু'একবার টিউশানীটা ছেড়ে দেবার কথাও মনে হয়েছে। কিছু ঠিক করতে না পেরে যথারীতি এসেছেও আজ আবার।

কিন্তু ছাত্রী নেই ধারে কাছে কোথাও। পড়ার ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলে পাখা চালিয়ে বেঞ্চে গিয়ে বসলো প্রিয়তোষ। সেখানে বসেই দু'একবার ডাকলো ছাত্রীর নাম ধরে, পাপিয়া-পাপিয়া—

কোথায় পাপিয়া? দু'চার মিনিট বসে থেকে মাষ্টার উঠবে উঠবে ভাবছিল এমন সময় হরিচরণ উঁকি দিলো দরজার বাইরে থেকে মাষ্টারবাবু এয়েছেন?

—হ্যাঁ, দিদিমণি কোথায়?

—আসেনি? বসুন ডেকে দিচ্ছি—

প্রিয়তোষ বসেই রইলো। প্রায় দশ মিনিট পরে ফিরে এলো হরিচরণ জল খাবার নিয়ে। বলল, আপনি খান, দিদিমণি আসছে। ব্যাপারটা ভালো লাগে না প্রিয়তোষের। তবু উঠতে পারে না। সময় কাটাবার জন্য জল খাবারের থালাটা টেনে নিলো সে। খেতে-খেতে ভাবতে লাগলো আজ আসুক পাপিয়া—কষে দু' থাপ্পড় লাগিয়ে দেবে সে ওর অবাধ্যতা ও অমনোযোগীতার জন্য। কেন, সে জানে না মাষ্টার এ সময় রোজ আসে?

আরও পনেরো মিনিট গেল। ঘড়িতে এখন পৌনে ছ'টা এ সময় বড় গিন্নী এলেন এ ঘরে। মাথায় এক হাত ঘোমটা দেখেই ওঁকে চিনলো প্রিয়তোষ। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে বড় গিন্নী ডাকলেন. মাষ্টারমশাই—

—ও আপনি—বলুন—

—আপনি আজ চলে যান মাষ্টারমশাই, আজ পাপিয়া পড়বে না আর।

—কেন?

—কি জানি—কিছুতেই আসতে চাচ্ছে না।

—কিন্তু একটা কারণতো থাকবে এই পড়তে না আসার। যান, ধরে নিয়ে আসুন জোর করে—আমি দেখছি কী হয়েছে।

বড় গিন্নী নড়লেন না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে বললেন আবার, আপনি বরং চলে যান মাষ্টারমশাই—ও আর পড়বে না বলেছে যখন কেউ পারবে না ওকে এ ঘরে আনাতে। কী করবো বলুন—আমারই ভাগ্য খারাপ। ভেবেছিলাম এবার আপনার কাছে পড়বে মেয়ে মন দিয়ে। কিন্তু এ মেয়ে সেরকম মেয়ে নয়। শুধু শুধু কষ্ট করলেন আপনি এতদিন।

প্রিয়তোষের এবার অবাক হবারই পালা। কী বলবে এরপরে ভেবে উঠতে পারলো না সে।

তার মুখ থেকে আপনা-আপনিই যেন বেরিয়ে এলো, আদর দিয়ে মেয়েকে একেবারে বাঁদর করে তুলেছেন আপনারা নিজেরাই—শুধু-শুধু আমাকে জড়ালেন এর মধ্যে, এ মেয়ের পড়াশোনা হবার নয় আপনার কিছুতেই।

বড় গিন্নী নীরব। হরিচরণ এসে ডাকলো এ সময় ওঁকে, বড়মা, আপনি এখানে—একবার উপরে আসুন, বড়দাদাবাবু ডাকছে যে আপনাকে।

—চলো।

বড়গিন্নী চলে যান হরিচরণের সংগে। প্রিয়তোষ কী করবে ভেবে উঠতে পারলো না।

দু'এক মিনিট তবু বোকার মতো সে ঘরে বসে থেকে অবশেষে সে-ও উঠলো এক সময়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা ঘটে যায়। সে সবগুলোকে মনে রাখতে পারি না আমরা। কিন্তু এমনি অনেক তুচ্ছ ঘটনা আমাদের ঘটে যা এক সময় হঠাৎ বিরাট একটা অনর্থের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। তখন অনুশোচনা করেও ফল হয় না।

পাপিয়াকে পড়ানো নিয়ে প্রিয়তোষকেও তেমনি একটি অবস্থার মুখোমুখি হতে হলো হঠাৎ। যেদিন প্রথম ওকে পড়িয়ে এলো সেদিন থেকেই ছোটগিন্নীর সংগে তার স্বাভাবিক সম্পর্কে ছেদ এলো একটা হঠাৎ ।

মাস তিনেকের মতো পড়িয়েছিল প্রিয়তোষ পাপিয়াকে। এ তিনমাসে ছোটগিন্নী যেন কেমন একটু আল্‌গা-আল্‌গা হয়ে গিয়েছিলেন মাষ্টারের ব্যাপারে।

খুব দরকার না পড়লে সামনে আসতেন না ওর, এলেও কথা বলতেন না বড় একটা। এমনকি তার খাওয়া-দাওয়া পরিচর্যা ইত্যাদির উপর নজরও রাখতেন না আগের মতো আর।

মাষ্টার বুঝেছিল ব্যাপারটা। কিন্তু এদের কাজে অবহেলা না করেও যদি সে পারে তার অবসর সময়ে আর একটা টিউশানী করে দু'টো টাকা রোজগার করতে সে ছাড়বে কেন তা'—তাই এক রকম জেদ্ করেই পড়িয়ে যাচ্ছিল সে পাপিয়াকে। বরাবরই একটু আদর্শবাদী সে, কোন অন্যায়ের সংগে সহজে আপোষ করে চলাটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

সংসারে বৃহৎ স্বার্থে অনেক সময় ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়, কখনও অন্যায়ের সংগে কিছুটা আপোষ করে চলতেও হয় বৈকি এ শিক্ষা ছিল না প্রিয়তোষের। তার ফল ভোগ করতে হলো হয়তো সেদিন তাকে তাই আকস্মিক।

পাপিয়াকে পড়ানো ছাড়ার পরের দিন। যথারীতি চারটে নাগাদ কলেজস্ট্রীট থেকে বেরিয়ে সাড়ে চারটায় শিয়ালদহে এসেও ট্রেনে উঠল না সে।

দীপকদের পড়ানোর টাইম সেই সাতটায়—কী করবে সে এত তাড়াতাড়ি বালিগঞ্জ ফিরে। আরও ঘণ্টা দুই পরে সাড়ে ছ'টার গাড়ি ধরলেই হবে।

ঘণ্টা দুই প্লাটফরমের বেঞ্চে বসেই কাটিয়ে দিলো প্রিয়তোষ।

এই দু'ঘণ্টা বসে চিন্তা করলো সে পাপিয়াকে। মেয়েটাকে পড়িয়ে পাস করিয়ে দেবে সে এ রকম একটা ইচ্ছে ছিল—হল না।

কিন্তু কেন, দু'চারদিন অত উৎসাহ দেখিয়ে তারপরে অমনি অমনোযোগী হয়ে গেল কেন পাপিয়া?

কিছুই ভেবে উঠতে পারলো না প্রিয়তোষ। এ ব্যর্থতার জন্যে কোনদিক দিয়ে সে কি জড়িত? জবাব পেল না মনের কাছ থেকে।

নিজের বর্তমান নিয়ে এর পরে অনেক কিছু ভাবলো সে—ভাবলো ভবিষ্যতের কথা। দু' পয়সা জমছে বটে এখন হাতে কিন্তু ভবিষ্যত কি তার?

ভাবতে-ভাবতে এক সময় নজর পড়লো ঘড়ির দিকে। সাড়ে ছ'টা। না, উঠতে হয় এবার—এ ট্রেনটা ধরতে হবে।

ট্রেনটা লেট করেছিল একটু পথে—কী একটা গোলমাল ছিল সিগ্‌ন্যালের ব্যাপারে।

তবু কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মধ্যে বালিগঞ্জে নামতে পারলো সে। এবং তিন চার মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছতে পারলো ঠিক সবুজ বাড়িতে।

সিঁড়ি দিয়ে সোজা তিনতলায় উঠে এলো প্রিয়তোষ। দ্বিতল পার হবার সময় তাকালো একবার ঘর গুলোর দিকে—যদি পাপিয়াকে কোথাও দেখা যায়।

না, দেখা হলো না—কাল সন্ধ্যার পর থেকেই আর দেখা হয়নি ওর সংগে।

ছোটগিন্নীর শয়ন কক্ষের পাশের কক্ষে এলো প্রিয়তোষ।

এই ঘরেই সন্ধ্যায় পড়াতে বসতে হয় দীপক, অঞ্জু ও অমিতাকে। সকালেও দীপক আজকাল এ ঘরে পড়ে। রাতে প্রিয়তোষ এ ঘরেই শোয়।

'এ বাড়িতে এ ঘরটি ছোট তরফের সবার ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট হলেও মাষ্টারের থাকার ঘর এইটিই।

এখন সন্ধ্যা সাতটা পাঁচ-সাত হবে। ঘরে ঢুকেই অবাক হলো প্রিয়তোষ। আজ সে আসবার আগেই সব পড়তে বসেছে তক্তপোষটার উপরে তিনজনেই।

একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে পড়াচ্ছে ওদের পাশেই একটা চেয়ারে বসে।

ছেলেটি গেঞ্জী গায়ে ও একটি লুঙ্গি পরা। কে এ ছেলেটি—নিশ্চয় এদের কোন আত্মীয়। যাক, সে ওদের আজ একটু আগেই নিয়ে বসেছে ভালই হয়েছে।

আর একটি চেয়ার ছিল দরজার কাছাকাছি। প্রিয়তোষ সেটিতে বসে ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলল, বাঃ তোমরা দেখছি বেশ ভালো হয়ে গেছ সবাই, আমি আসবার আগেই পড়তে বসেছ দেখছি—বেশ, বেশ !

পড়ানোয় ব্যস্ত ছেলেটি কথা বলে উঠলো এবার হঠাৎ, আপনি বুঝি এদের মাষ্টার মশাই ?

—হ্যাঁ।

—কী নাম আপনার ?

—কেন বলুন তো ?

—এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম—মানে একটু আলাপ করতে চাচ্ছি আপনার সংগে !

—ওঃ এই কথা—আমার নাম—

নাম বলল প্রিয়তোষ।

মাষ্টার ছেলেটি এর পরে প্রশ্ন করে করে আরও অনেক কিছু জেনে নিল তার পরিচয়। যেমন তার বাড়ি কোথায়, কত দিন সে এদের পড়াচ্ছে, সে আর কি কাজ-টাজ করে, এখানে তার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি।

দীপক অঞ্জু ওরা এতক্ষণ পড়া থামিয়ে ওদের দু'জনের আলাপ আলোচনা শুনছিল।

এখন ফাঁক পেয়ে হঠাৎ বলে উঠলো দীপক, এই মাষ্টার এবার থেকে রোজ পড়াবে আমাদের মাষ্টার মশাই !

প্রিয়তোষ এটাকে ঠাট্টা মনে করে বলল, বেশতো—

ছোটগিন্নী পাশে নিজের ঘরেই ছিলেন। এ সময় হঠাৎ তিনি ডাকলেন, মাষ্টার মশাই ?

—কি বলছেন ?

—একটু এদিকে আসবেন ?

—কেন ?

—একটু আসুন না দয়া করে।

—কিছু বলবেন ?

—হ্যাঁ।

—আসছি।

প্রিয়তোষ উঠে সংগে-সংগেই ছোট গিন্নীর ঘরে গেল মাঝের দরজাটার পরদা ঠেলে। উনি মেঝেয় বসেছিলেন পানের বাটা নিয়ে। সে ঢুকতেই খাটের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, একটু বসুন ওখানে।

গৃহকর্ত্রীর আদেশ মনে করে নির্দ্বিধায় প্রিয়তোষ বসলো বিছানার একধারে পা ঝুলিয়ে।

গলাটা একটু খাটো করে ছোট গিন্নী বললেন এবার, একটা মুসকিল হয়ে গেল যে মাষ্টার মশাই !

—কী ?

—ওই ছেলেটিকে তো দেখলেন ?

—হ্যাঁ।

—সে এসেছে আজ দুপুরে আমার বাপের বাড়ির দেশ থেকে। ওর বাবা আমার মাকে দিদি ডাকে সেই হিসেবে ও আমার মামাতো ভাই। স্কুল ফাইনাল পাস করেছে এবার। দেশেতো কলেজ নেই তাই কলকাতায় এসেছে পড়তে। এবার থেকে থাকবে এখানে।

—তা এসে যখন পড়েছে থাকুক না। ভাতের অভাব তো আপনাদের নেই। সম্পর্কে ভাই হয় যখন তখন না হয় দিদির বাড়ি থেকে দু'টো খেয়েই না হয় পড়াশুনা করবে।

—হ্যাঁ, আমিও সেই রকম ভেবেছি। কিন্তু দু'জনকে রাখা তো সম্ভব নয়—তাই ভাবছি এবার থেকে সে-ই পড়াবে দীপক ওদের, অবশ্য মাইনে ওকে দিতে হবে না এ জন্যে।

মুহূর্তে সবই যেন জলের মতো পরিস্কার হয়ে গেল প্রিয়তোষের কাছে। তবু নিঃসন্দেহ হতেই সে বলল আবার, তা' আমাকে কি করতে বলছেন?

—আপনাকে কী বলব তাই ভাবছি, আপনি এতদিন পড়ালেন?

—তাতে কী হয়েছে—যদি বলেন আমি না হয় চলে যাবো।

—সে কথা কি বলতে পারি আপনাকে?

দুঃখে অভিমানে রাগে ও লজ্জায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো হৃদয়।

ষড়যন্ত্র! ভিতরে-ভিতরে তাকে না জানিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে এখন ন্যাকামি হচ্ছে—ধন্য বৈষয়িক লোকের বুদ্ধি, ধন্য তাদের ভদ্রতা বোধ।

অবশ্য, একদিন চলে যেতে তো হতোই তাকে। কিন্তু এভাবে হঠাৎ এটা মেনে নেওয়া যায় কী করে? তবু উপায় নেই মেনে না নিয়ে—সবই ভাগ্য।

পরম নিশ্চিন্তে ছিল এতকাল প্রিয়তোষ। তার খেসারত তো তাকে দিতে হবে—হ্যাঁ, দিতে হবেই।

বলল, আপনি না বললেও আমার আর থাকা উচিৎ নয় এখানে—তাছাড়া এই ছেলে-মেয়ে পড়ানো ব্যাপারটা ভালো লাগে না আমার কোনদিন, নেহাত অর্থনৈতিক কারণেই এসেছিলাম আপনাদের বাড়ি—ভালোই হলো।

ছোট গিন্নী নীরব।

মাষ্টার উঠলো। বলল, আমি তাহ'লে চলি—

—কোথায় যাবেন এখন?

—কেন, সোনারপুরে—একটা ভাড়া নেওয়া ঘর তো আমার সেখানে পড়েই আছে।

—তা' এখুনি কি—খেয়ে দেয়ে যাবেন রাতে।

—না আজ আমি আর খাবো না।

ছোটগিন্নী উঠে পড়লেন সংগে সংগেই। দ্রুত ওর সামনে এসে পথ বোধ করে বললেন, না খেয়ে গেলে আমি খুব দুঃখ পাবো মাষ্টার মশাই—খেয়ে যান অন্ততঃ আজকের দিনটা, না খেলে ভাববো আপনি রাগ করে যাচ্ছেন।

—ঠিক আছে—খেয়েই যাবো আজ। দেখুন রান্নার কতদূর। যা যা হয়েছে রামমোহনকে বলুন তাই দিয়ে আমাকে খেতে দিতে।

—একটু বসুন, আমি এখুনি দেখছি।

প্রিয়তোষ বসলো, ছোটগিন্নী বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সংগে-সংগেই একটি আসন এক গ্লাস জল এনে এ ঘরের মেঝেয় ঠাঁই করে দিলেন একটি।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই খাদ্যবস্তুগুলি নিয়ে হাজির করলো রামমোহন। খেতে বসলো প্রিয়তোষ—মনের অবস্থা এখন তার ভালো নয়, কোন রকমে বেরিয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে সে এখন এ বাড়ি থেকে।

রাত মাত্র আটটা পাঁচ। এত রান্না করলো আজ এরি মধ্যে রামমোহন? বহু কিছু আয়োজন হয়েছে আজ। প্রত্যহের চেয়ে অনেক তো বেশি বটেই। মাছ চার রকম মাংস তরকারী ডাল ভাজা দই মিষ্টি।

ছোট গিন্নী বসেছিলেন পাশে ঠিক সেই প্রথম দিনটার মতোই। যত্ন করে খাওয়ালেন সব কিছু-কিছু।

ওঁকে আঘাত দেবার জন্যই হয়তো একবার বলে ফেলল প্রিয়তোষ. এত তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে গেল যে সব আজ এ বাড়ির?

ছোটগিন্নী ধীর ভাবে জবাব দিলেন, রামমোহন ন'টার শো'তে সিনেমায় যাবে আজ—তাই বেলা এগারটার সময় আঁচ ধরিয়ে রান্না বসিয়েছে, কেমন হয়েছে রান্না?

—ভালো।

প্রিয়তোষ উঠলো। মুখ ধু'লো।

সেই আগের দিনের মতো পান দিলেন হাতে ছোট গিন্নি। তারপর বললেন, ছোটবাবুতো বাড়ি নেই—আপনার এ মাসের মাইনেটা ক'দিন পরে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো মাষ্টার মশাই!

—আচ্ছা।

এ ঘরে এলো প্রিয়তোষ। নিজের দু'এক খানা জামা কাপড় গামছা-লুঙ্গি যা ছিল গুছিয়ে একটা খবরের কাগজে মুড়ে প্যাকেট করে নিল।

ছাত্র ছাত্রীরা আজ অতি মনোযোগী হয়ে উঠেছে সবাই। পড়ে চলেছে নতুন মাষ্টারের কাছে।

ওদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো প্রিয়তোষ, তোমরা সবাই কিন্তু ভালো করে পড়বে এবার থেকে নতুন মাষ্টারের কাছে—আমি চলে যাচ্ছি তোমাদের বাড়ি থেকে, আর আমি আসবো না কাল থেকে তোমাদের পড়াতে।

দীপক প্রশ্ন করলো, কেন মাষ্টারমশাই?

—আমায় অন্য কাজ করতে হবে এবার থেকে।

—আমাদের তা'হলে আর বেড়াতে যাওয়া হবে না তো?

—বেড়ানোটাই কি আসল? পড়ার জন্যই তো বেড়ানো—তা তোমরা পড়না মোটেই মন দিয়ে।

ছাত্র ছাত্রীরা কিছু বলল না এ কথার জবাবে। সবাই চুপ করে মাথা নীচু করে রইলো। প্রিয়তোষ বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন ছোটগিন্নী।

প্রিয়তোষ বিদায় নিল ওঁর কাছ থেকে, তবে আসি—যদি নিজের অজ্ঞাতে কোন অপরাধ করে থাকি আপনাদের কাছে ক্ষমা করবেন আমায়!

—সে কি কথা, কিছু অন্যায় করেননি আপনি—আপনার মতো

মাষ্টার অনেক ভাগ্য করেই পেয়েছিলাম আমরা। আমাদের ভাগ্য খারাপ তাই আমরা রাখতে পারলাম না আপনাকে।

বলেই শাড়ীর আঁচলে নিজের চোখ দু'টো চেপে ধরলেন ছোট গিন্নী সহসাই।

এক মুহূর্ত নীরবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে নিচের দিকে পা বাড়ালো প্রিয়তোষ। দ্বিতলের সিঁড়ির মুখে সামনা-সামনি দেখা পাপিয়ার সংগে। সে প্রণাম করলো পায়ে হাত দিয়ে কিন্তু কিছু বলল না—চুপ চাপ একধারে সরে দাঁড়ালো।

প্রিয়তোষ দেখলো পাপিয়ার চোখ দুটো ছলছল করছে। একবার মাত্র ওর মুখের দিকে তাকালো সে। তারপর সেও কিছু বলল না। নীরবে নেমে গেল নিচের দিকে।

ওর মাথাটা ঘুরে উঠেছে এখন, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল একটু আগেই—এখন বুকের মধ্যে অলক্ষ্যে বসে কে যেন সজোরে হাতুড়ি পিটোতে লাগলো।

মনে হলো এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজপথের খোলা হাওয়ায় না পৌঁছাতে পারলে হয়তো দম বন্ধ হয়ে যাবে ওর এবার।

দ্রুত পায়ে হেঁটে একদম নিচতলায় নেমে এলো এবার প্রিয়তোষ।

তারপর একবার পিছনে ফিরে কেন যেন তাকিয়ে বেরিয়ে পড়লো সবুজ বাড়ি থেকে রাজপথে।

স্পষ্টই দেখতে পেলো সে এবার দ্বিতলের সেই ঝুল্ বারান্দায় পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাপিয়া। ওর মুখটা ম্লান।

সামনে পা' বাড়ালো প্রিয়তোষ। একবার মনে হলো তার, কেন যেন অকারণেই মনে হলো, কোন রকমে পাপিয়াই কি দায়ী তাকে এ বাড়ি থেকে এ ভাবে হঠাৎ মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে?

যে মুক্তি সে চেয়েছিল চিরদিনই আজ তা' পেয়েও কেন স্বস্তি নেই প্রিয়তোষের। বিরাট একটা অপমানের বোঝা কে যেন চাপিয়েই দিলো তার মাথায় জোর করে। কিন্তু কেন?

একটা ট্রেন ইন্ করলো বালিগঞ্জ ষ্টেশনে। সোনারপুরে যাবার এর পরের ট্রেন পঞ্চাশ মিনিট পরে। দৌড়ে গেল সে গাড়িটার দিকে।

(প্রথম পর্ব সমাপ্ত)